জীবন জাগার গল্প ১

কিশোর কমান্ডার

মোশাররফ হোসেন খান

জীবন জাগার গল্প-১

কিশোর কমান্ডার

মোশাররফ হোসেন খান

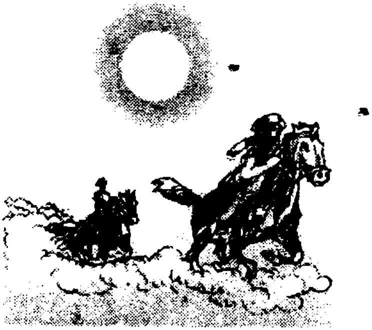

www.pathagar.com

কিশোর কমান্ডার
মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ

যোগাযোগ
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার,
[ডাক্তারের গলি] ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৩২৪১০, ০১৭১৫৮১২৫৫

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০০৫

বাসাপপ্র ১২৩

প্রচ্ছদ
ফরীদি নূমান

মুদ্রক
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

বিনিময়: ২০ টাকা মাত্র

ISBN-984-485-093-2
BSP-123-2005

www.pathagar.com

কিশোর কমান্ডার

মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশনায়

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

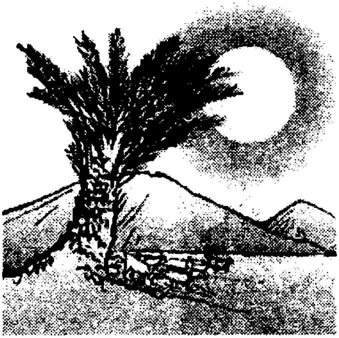

সূচী

সাহসের আগ্নেয়গিরি ৫

সত্যের পথে প্রথম শহীদ ১১

ভেজা কাফনের বাসিন্দা ১৬

কিশোর কমান্ডার ২৩

আলোর মিছিল ২৮

উড়ন্ত শহীদ ৩৮

খাঁটি হলেন আলোক সমান ৪৪

সাহসের ঢেউ ৪৯

স্বপ্ন যখন সত্য হলো ৫৪

বন্ধু তিনি পরম প্রিয় ৫৮

www.pathagar.com

সাহসের আগ্নেয়গিরি
হযরত মুয়াজ ইবন জাবাল

প্রতিভাবান এক অসাধারণ সাহসী সাহাবী। বুকে ছিল তার সত্য ও ন্যায়ের তুফান। হৃদয়ে ছিল আল্লাহ ও রাসূল প্রেমের সাতটি সাগর। আর চোখে ছিল সঠিক পথে চলার জন্যে সূর্যের প্রদীপ। জ্বল জ্বল করে জ্বলতো সারাক্ষণ। প্রদীপের সামনে-পেছনে ছিল আল্লাহ এবং রাসূলের ভালোবাসার ফল্গুধারা। তাদের ভালোবাসা নিয়ে নির্ভয়ে পথ চলতেন মুয়াজ। খুব সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন তিনি। তার জীবনে ছিল না এতোটুকু বিলাস ব্যাসন। ছিল না পোশাক পরিচ্ছদে জাঁকজমক। ছিল না খাওয়া দাওয়ায় নবাবী ভাব।

সাধারণ গরীব দুঃখীদের জন্য মুয়াজের খুব কষ্ট হতো। তাদের দুঃখে তিনি কাতর হতেন। তাদের ব্যথায় তিনিও ব্যথিত হতেন। সেই ব্যথার কারণে তার কলিজায় খুন ঝরতো। গরীব দুঃখীদের কষ্ট দূর করার জন্যে দু'হাতে দান করতেন অঢেল অর্থ।

মুয়াজের সম্পদ তেমনটি ছিল না। যা ছিল তার সবই তিনি বিলিয়ে দিতেন অকাতরে। কিন্তু তাতেও গরীবের দুঃখ শেষ হতো না।

www.pathagar.com

দেবার মতো আর সম্পদও তার হাতে নেই। তাদের দুঃখও তিনি সইতে পারেন না। কি করবেন মুয়াজ? বাধ্য হয়ে হাত বাড়ালেন ঋণের দিকে। মুয়াজ ঋণ করেন। আর তা বিলিয়ে দেন গরীব দুঃখীদের মধ্যে। অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার জন্যে।

ঋণ করতে করতে তার পরিমাণ বাড়লো। সে পরিমাণ অনেক বড়ো। মুয়াজের যে সম্পদ ছিল তার চেয়েও বেশি। ঋণ শোধ করতে অক্ষম হলেন তিনি। ফলে তার সহায় সম্পত্তি নিলামে উঠলো।

গরীব দুঃখীদের প্রতি মুয়াজের ভালোবাসার কোন সীমা ছিল না। তাদের জন্যে সকল কিছু বিলিয়ে দিয়েও তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। কিন্তু নিজের ব্যাপারে ছিলেন খুবই সতর্ক। নিজের জন্যে কখনো কোনো বাহুল্য ব্যয় তিনি করতেন না। প্রয়োজন বোধ করতেন না নিজের জন্যে তেমন কিছু। কারুর দানকে তিনি গ্রহণ করতে চাইতেন না কখনো। এতোবড়ো সাহাবী হয়েও সর্বদা থাকতেন আল্লাহর ভয়ে ভীত। প্রকম্পিত।

একবার এক এলাকার নেতারা তাকে বললেন-মুয়াজ, আপনি চাইলে আপনার জন্যে ইট দিয়ে একটি পাকা মসজিদ বানিয়ে দেই। আরামে এবং খোশহালে নামায আদায় করতে পারবেন সেখানে।

জবাবে মুয়াজ বললেন, কিয়ামতের দিন এই মসজিদ আমার পিঠে বহন করতে বলা হয় কিনা সে ব্যাপারে আমি শংকিত। সুতরাং প্রয়োজন নেই আমার পাকা মসজিদের।

আল্লাহর প্রতি এই ভালোবাসা এবং মহব্বত তিনি শিখেছিলেন নবীর (সা) কাছে। নবীকে (সা) মুয়াজ প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন। নবীও (সা) তাকে ভালোবাসতেন তেমনি।

মুয়াজকে তিনি শিক্ষা দিতেন সকল সময়ে। সকল বিষয়ে।

মুয়াজকে ইয়ামানের আমীর নিযুক্ত করলেন নবী (সা)।

www.pathagar.com

মুয়াজ যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিলেন। নবীজী (সা) তাকে বললেন, মুয়াজ! মজলুম বা অত্যাচারীদের বদ দুয়া থেকে সর্বদা দূরে থাকবে। কারণ সেই বদ দুয়া ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক থাকে না।

তিনি আরো বলেন, মুয়াজ! ভোগ বিলাসিতা থেকে দূরে থাকবে। কারণ, আল্লাহ্‌র বান্দা কখনো আরামপ্রিয় ও বিলাসী হতে পারে না। মনে রাখবে মানুষের নেকড়ে হচ্ছে শয়তান। নেকড়ে যেমন দলছুট বকরীকে ধরে নিয়ে যায় তেমনি শয়তানও এমন মানুষের ওপর প্রভুত্ব লাভ করে যে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। সাবধান! কখনো বিচ্ছিন্ন থাকবে না।

মুয়াজ আমৃত্যু মনে রেখেছিলেন নবীর (সা) এই শিক্ষা। তাঁর উপদেশ।

খুব সাধারণ ছিল মুয়াজের জীবন যাত্রার মান। অনাড়ম্বর ছিল ততোধিক। বাহুল্যতাকে পছন্দ করতেন না কখনো।

একদিনের ঘটনা।

শামের ফাহল নামক স্থানে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। মুসলমানদের প্রস্তুতির কথা জেনে ঘাবড়ে গেল রোমান বাহিনী। তারা ভয়ে প্রস্তাব দিল সন্ধির।

মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু উবাইদা। মুয়াজ এই যুদ্ধের একজন দক্ষ সৈনিক। দূত হিসাবেও তিনি খুবই যোগ্য। আবু উবাইদা মুয়াজকে পাঠালেন রোমান সেনা ছাউনীতে। দুঃসাহসী মুয়াজ।

তিনি মাথা উঁচু করে পৌছে গেলেন রোমান সেনা ছাউনীতে। পৌছেই তার চক্ষু ছানাবড়া। বিস্ময়ের আর অন্ত নেই। একি অবস্থা! তাঁবুর ভেতরে সোনালী কারুকাজ করা গালিচা বিছানো। দরবারের চারপাশে জাঁকজমকের ছড়াছড়ি। বাদশাহী ব্যাপার স্যাপার।

www.pathagar.com

মুয়াজকে দেখে রোমান সৈনিকরা খুশি হলো। তাকে স্বাগত জানালো একজন পদস্থ খ্রীস্টান সৈনিক।

মুয়াজ তখনো বাইরে দাঁড়িয়ে। খ্রীস্টান সৈনিকটি বললো, আমি আপনার ঘোড়াটি ধরছি। আপনি তাঁবুর ভেতরে যান।

মুয়াজের চোখে মুখে অবজ্ঞা আর প্রত্যাখ্যানের কালো মেঘ। গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন, আমি এমন শয্যায় বসি না, যা দরিদ্র লোকদের বঞ্চিত করে তৈরি করা হয়েছে। এই বলে মাটির ওপর বসে পড়লেন মুয়াজ।

খ্রীস্টানরা অবাক হলো মুয়াজের আচরণে। দুঃখ প্রকাশ করে তারা বললো, আপনি খুব নামীদামী ব্যক্তি। চারদিকে আপনার সুনাম সুখ্যাতি। আমরা চেয়েছিলাম আপনাকে যথাযথ সম্মান দিতে। অথচ কি আশ্চর্য! আপনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন এমনি ঘৃণাভরে!

একটু মুচকি হাসলেন মুয়াজ। বললেন, এমন সম্মানের প্রয়োজন নেই আমার। আমি অতি সাধারণ এক মানুষ। মাটিতে বসতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

খ্রীস্টানরা ভীষণ অবাক হলো। তাদের কণ্ঠে উপচে পড়ছে বিস্ময়। বলেন কি! আপনি সাধারণ মানুষ? আমরা জানি আপনি কতোটা বড়ো। মাটিতে বসা আপনার জন্যে আদৌ মানায় না। মাটিতে বসে তো দাস শ্রেণীর মানুষ।

ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন মুয়াজ। ঠিকই বলেছো। দাসেরাই কেবল মাটিতে বসে। মাটিতে বসা যদি দাসদের অভ্যাস হয়, তাহলে জেনে রেখো-আমার চেয়ে আল্লাহর বড়ো দাস আর কেউ নেই। অবাক ব্যাপার!

খ্রীস্টানরা মুয়াজের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো। আবার নড়ে উঠলো তাদের শুকনো জিহবা। বললো, আপনার চেয়েও কি কোনো মর্যাদাবান শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আপনাদের সমাজে আছে?

www.pathagar.com

জোরে হেসে উঠলেন মুয়াজ।
খ্রীস্টানরা ঘাবড়ে গেল তার সে হাসির গমকে। মুয়াজ বললেন, কে বলেছে আমি মর্যাদাবান শ্রেষ্ঠ? মুসলমানদের মধ্যে আমিই হচ্ছি নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। আমার মতো এতো অধম নালায়েক বান্দা মুসলমানদের মধ্যে আর কেউ নেই।
মুয়াজের এই উচ্চারণে খ্রীস্টানরা বিস্ময়ে হতবাক। কিছুতেই কাটতে চায় না তাদের কুয়াশাঘোর। কালিমা ঘেরা তাদের পুরু হৃদয়ের একপাশে মুয়াজের এই উচ্চারণের ধ্বনিটি গভীর ফাটলের সৃষ্টি করলো-তারা ভাবতে থাকলো মুসলমানের আদর্শ এবং ঐতিহ্য নিয়ে। তারা ভাবতে থাকলো মুসলমানের সাহস আর বীরত্ব নিয়ে। তারা অনুভব করলো, স্বার্থত্যাগী, জীবন উৎসর্গকারী এই মুসলিম সৈনিকদের সাথে, আল্লাহর একান্ত দাসদের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।
হিজরী পনের সন। ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলছে। ভীষণ যুদ্ধ। শত্রুপক্ষ দুর্বার গতিতে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।
মুয়াজের দায়িত্বও বেশ বড়ো। কঠিন। একটি দিকের যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর। তার বাহিনী প্রাণপণে যুদ্ধ করছেন। কিন্তু শত্রুপক্ষকে কিছুতেই পরাস্থ করা যাচ্ছে না। বরং তারা ক্রমেই এগিয়ে আসছে মুয়াজের বাহিনীর দিকে।
মুসলমান কখনো বিপদ দেখে ঘাবড়াতে পারে না। হারাতে পারে না মনোবল এবং ঈমান। মুয়াজতো একজন পরীক্ষিত ঈমানদার। তিনি পিছপা হবেন কিভাবে? না! পিছপা হলেন না সাহসী মুয়াজ। মুহূর্তেই তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নিচে নামলেন। তার বাহিনীকে বললেন, আমি পায়ে হেঁটে লড়বো। আমার বাহিনীর কোনো সাহসী বীর যদি থাকে, তাহলে সে আমার ঘোড়ার হক আদায় করতে পারে।

www.pathagar.com

ঘোড়ার হক আদায় করার মানে মুয়াজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আরো তীব্রবেগে যুদ্ধ করা।

পাশেই ছিলেন মুয়াজের পুত্র। তিনিও ইয়ারমুকের যুদ্ধে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন।

যেমন পিতা তেমনি পুত্র।

তিনি জবাব দিলেন, আব্বা, দোয়া করুন। আমিই আপনার ঘোড়ার হক আদায় করবো ইনশাআল্লাহ্।

কি আশ্চর্য।

মুয়াজ, তার পুত্র এবং তার বাহিনী সত্যি সত্যিই ইয়ারমুকের যুদ্ধে পুনর্বার জ্বলে উঠলেন।

মুয়াজ রোমান বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে প্রবেশ করলেন তাদের ভেতরে।

তার সাহসের ফুলকিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্র। বিক্ষিপ্ত মুসলিম যোদ্ধারা আবার খুঁজে পেল আস্থার পর্বত।

হযরত মুয়াজ, নবীর (সা) শিক্ষায় যিনি ছিলেন শিক্ষিত। নবীর (সা) প্রেম, ভালোবাসা এবং তার আদর্শই ছিল যার প্রার্থিত, সেই মুয়াজই ছিলেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দাসের মধ্যে অন্যতম দাস।

দয়া মায়ায় ভরা ছিল তার হৃদয়। সংযম আর সাহসী ঈমান ছিল তার একমাত্র ভূষণ। অসত্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জুলুম আর অবিচারের বিরুদ্ধে মুয়াজ ছিলেন বজ্রকঠিন-সাহসের আগ্নেয়গিরি। ছিলেন ভয়ংকর এক উজানের ঢল।

যাকে রোখার সাহস রাখতো না কোনো বেঈমান-কাফের।

www.pathagar.com

সত্যের পথে প্রথম শহীদ

ভাইটিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। খুঁজে খুঁজে হয়রান হলেন ইয়াসির। ভাইকে খোঁজ করতে এক সময় তিনি এলেন মক্কা নগরীতে। তাঁর সাথে আছেন আপন দুই ভাই। আর আছেন তাঁর স্ত্রী-সুমাইয়া।

সুমাইয়া ছিলেন খাবাতের অত্যন্ত আদরের দুলালী। খাবাত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন তার মেয়েকে।

সেই প্রাণপ্রিয় মেয়েকেও দাসীবৃত্তি করতে হতো।

সুমাইয়া ছিলেন ইবনে মুগীরা মাখযুমীর একজন দাসী।

ইবনে মুগীরার বন্ধু ছিলেন ইয়াসির। খুব কাছের বন্ধু। যাকে বলে মানিকজোড়। সেই ইয়াসিরের সাথে বিয়ে হলো সুমাইয়ার।

বিয়ের পর।

অনেকগুলো বছর কেটে গেছে তাদের জীবনের ওপর দিয়ে।

এরই মধ্যে হারিয়ে গেলো ইয়াসিরের একটি ভাই।

ইয়াসির তাকে খুব ভালোবাসতেন। সেই ভাইকে খোঁজ করতেই তারা একদিন উপস্থিত হলেন মক্কায়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা থেকে সকাল। এভাবে মক্কার অলি গলি খুঁজে বেড়ান ইয়াসির। সুমাইয়া তাঁর সাথে থাকেন। খোঁজেন তাঁদের প্রাণপ্রিয় ভাইটিকে।

কিন্তু না।

www.pathagar.com

কোথাও পাওয়া গেল না তাকে।

অবশেষে একদিন ইয়াসিরের দুই ভাই হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন ইয়ামেনে। স্বদেশে।

কিন্তু মক্কায় থেকে গেলেন ইয়াসির এবং তাঁর স্ত্রী হযরত সুমাইয়া।

মক্কায় তখন বয়ে যাচ্ছে অন্য রকম এক হাওয়া। ঝির ঝির ঝির ঝির। ক্রমাগত। সেই হাওয়ার নাম-ইসলাম।

নবী মুহাম্মাদ (সা) মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেছেন। চুপি চুপি।

নবীজীর ডাকে তখন সাড়া দিয়েছেন মাত্র কয়েকজন হাতেগোনা সাহসী মানুষ।

এই সাহসী মানুষের কাতারে এসে দাঁড়ালেন হযরত সুমাইয়া এবং তাঁর স্বামী হযরত ইয়াসির। নবীজীর ডাকে যারা সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সুমাইয়া অন্যতম। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সপ্তম।

ইসলাম প্রচারের একেবারেই প্রথম দিকের কথা।

তখন যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন তাদের ওপর ক্ষেপে উঠতো কুরাইশরা।

আর তাদের ওপর চালাতো অকথ্য নির্যাতন। সেই নির্যাতনের নিষ্ঠুরতায় কেঁপে উঠতো আল্লাহর আরশ।

কেঁদে উঠতো আকাশ আর বাতাস।

পশু পাখিদের চোখেও নেমে আসতো বেদনার শ্রাবণী ধারা।

কিন্তু তারপরও।

তারপরও থামতো না অত্যাচারের চাবুক।

সেই জালিমদের হাজারো অত্যাচার আর নির্যাতনের মুখেও নিষ্কম্প থাকতো সাহসী মানুষের ঈমান।

তাঁরা টলতেন না কখনো।

www.pathagar.com

অত্যাচারের ভয়ে সরে দাঁড়াতেন না ইসলামের পথ থেকে।
বরং যতই আঘাত আসতো, ততোই তাঁদের সাহস আরও বেড়ে যেতো। যেমন বাতাসের বেগ যতো বেড়ে যায়, ততোই জেগে ওঠে সমুদ্রের তুফান।
সেই কঠিন সময়ে ইসলাম কবুল করলেন ইয়াসির এবং তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া। তাঁরা জানতেন, ইসলাম কবুল করলে তাঁদের ওপর নেমে আসবে নির্মম অত্যাচার।
তবুও। তবুও রাসূলের ডাকে সাড়া দিলেন তাঁরা। ফিরে দাঁড়ালেন আল্লাহর দিকে। সত্যের দিকে। রাসূলের (সা) দিকে।
ব্যাস! ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল তাদের ওপর কুরাইশদের অত্যাচার।
ইয়াসির তখন বয়সের ভারে কাতর।
সুমাইয়ারও বয়স বেড়েছে। তিনি তখন সম্পূর্ণ বৃদ্ধা। তার ওপর ছিলেন রোগাটে। ছিলেন শারীরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল।
এই দুর্বল মানুষটিই ছিলেন ঈমানের দিক দিয়ে দারুণ সবল। তাঁর বুকে ছিল অসীম সাহস। সাহসের সমুদ্র।
একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের নাম হযরত সুমাইয়া। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কুরাইশরা তাকে কষ্ট দিতো সর্বক্ষণ।
লোহার পোশাক পরিয়ে বর্বর কুরাইশরা সুমাইয়াকে দাঁড় করিয়ে দিতো মরুভূমির ঠা ঠা রোদের ভেতর।
উত্তপ্ত বালুর ওপর।
তৃষ্ণায় তাঁর বুকের ছাতি শুকিয়ে যেত। পানি পানি বলে চিৎকার করলেও তাকে এক ফোটা পানি এগিয়ে দিতো না কেউ। তখনো সুমাইয়া থাকতেন ঈমানের ওপর পর্বতের মতো অটল।
তখনো তিনি থাকতেন ধৈর্য আর সংযমের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে। তখনো তিনি সাহায্য প্রার্থনা করতেন একমাত্র আল্লাহর কাছে।

www.pathagar.com

রাসূল (সা) জানতেন সুমাইয়ার ওপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা।
নবীজী (সা) তো দয়ার সাগর।

সুমাইয়ার কষ্টে তাঁরও হৃদয়ে বয়ে যেত কষ্টের তুফান। বেদনায় ভিজে যেত রাসূলের পবিত্র দু'চোখ।

হাত তুলে তিনি দোয়া করতেন-তাঁর জন্যে। আর বলতেন।

ধৈর্য ধারণ করো ইয়াসির পরিবার। তোমাদের জন্যে রয়েছে মহা সম্মানিত পুরস্কার জান্নাত।

সুমাইয়ার পরিবারটি ছিল খুবই গরীব। অভাব ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী। কতদিন যে তাদের না খেয়ে চলে গেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তবুও তাদের মনে ছিল না এতোটুকু কষ্ট। ছিল না এতোটুকু দুঃখ। দুনিয়ার সুখ সম্ভোগ তাঁরা চাননি। দুনিয়ার বিলাস-ব্যাসন তাঁরা চাননি। তাঁরা চাননি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশ।

খুব কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করলেও সুমাইয়ার হৃদয়ে ছিল আনন্দের সাগর। ছিল খুশির ঢল।

সেই আনন্দ আর খুশির নাম আল্লাহ ও রাসূলের (সা) প্রতি অঢেল ভালোবাসা।

আর তাই শত কষ্টের মধ্যেও দৃঢ় থাকতেন তিনি আল্লাহর ওপর।

সুমাইয়ার ওপর কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা যতোই বেড়ে যেত, ততোই তিনি সাহসী হয়ে উঠতেন।

সেই কারণে তিনি আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন নিজেকে। নিজের পরিবারকে। শারীরিকভাবে নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হয়নি ইসলামের দুশমনেরা।

কুরাইশ পাপীদের সর্দার আবু জেহেল হযরত সুমাইয়াকে বর্শার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছিল। এইভাবে ক্ষত বিক্ষত শরীর নিয়ে আল্লাহর দরবারে পৌছে গেলেন হযরত সুমাইয়া।

সুমাইয়ার শাহাদাতের করুণ চিত্র-আর হৃদয় বিদারক দৃশ্যের বর্ণনা

www.pathagar.com

করতে রাসূলের কাছে ছুটে গেলেন তাঁর পুত্র হযরত আম্মার।
আম্মারের কাছে তার মায়ের শাহাদাতের বীভৎস চিত্রের কথা শুনে রাসূল (সা) চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলেন না। হু হু করে কেঁদে উঠলো রাসূলের (সা) কোমল হৃদয়।
দুহাত তুলে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন।
হে প্রভু! ইয়াসির পরিবারের কাউকে আগুনের শাস্তি এবং দোজখের শাস্তি দেবেন না। শুধু সুমাইয়া নন।
কুরাইশদের হাতে তাঁর পরিবারের শাহাদাৎ বরণ করেন একে একে স্বামী হযরত ইয়াসির ও তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহ।
তাঁর আর এক পুত্র হযরত আম্মার। তিনি বেঁচে ছিলেন। বদর যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন।

বদর যুদ্ধ। এক ভয়ংকর যুদ্ধ! এক অসম যুদ্ধ!
তবুও এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন মুসলিম বাহিনী।
এই বদর যুদ্ধে কুখ্যাত আবু জেহেল নিহত হলে রাসূল (সা) আম্মারকে বললেন, আল্লাহ পাক তোমার মায়ের হত্যাকারীকে হত্যা করেছেন।
তারপর নবী (সা) আবার হাত তুলে দোয়া করলেন- হে আল্লাহ! ইয়াসির পরিবারের লোকদের তুমি ক্ষমা করে দাও।
হযরত সুমাইয়া ইসলামের পথে প্রথম শহীদ।
সত্যের জন্যে সীমাহীন কুরবানী করার কারণে যার মর্যাদা বেড়ে গেছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছে অনেক বেশি। হযরত সুমাইয়া! একই সাথে যিনি অসীম সম্মানিতা এবং গৌরবান্বিতা।
শুধু মুসলিম ইতিহাসে নয়, সমগ্র মুসলিম জাতির হৃদয়েও হযরত সুমাইয়া-একটি গৌরবদীপ্ত নাম হিসাবে জ্বল জ্বল করে জ্বলে আছে। জ্বলতে থাকবে চিরদিন।

www.pathagar.com

ভেজা কাফনের বাসিন্দা

খন্দকের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে কুরাইশদের মধ্যে। তাদের তোড়জোড়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে মদীনার লোকেরাও। ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে কাফেরদের ভয়াল আক্রমণের তীব্র শিখা। মদীনার চারদিকে ঘিরে রয়েছে কুরাইশরা। মদীনাবাসীদের দুর্ভাবনায় ব্যথিত হলেন নবী মুহাম্মাদ (সা)। তিনি হাত তুলে দোয়া করলেন মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে। আর নিজের বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন মদীনার প্রতিরক্ষার জন্য খন্দক খননের।

রাসূলের নির্দেশে দ্রুত কাজ চলছে খন্দক খননের। এরই মধ্যে, হঠাৎ এক রাতে আচমকা শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি।

কুরাইশরা মদীনার আশপাশের বাগানে শিবির গড়েছে। তারা অপেক্ষা করছে আক্রমণের। কিন্তু আল্লাহর কী মেহেরবাণী! হঠাৎ ঝড় আর বাতাসের দাপটে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল কুরাইশদের শিবির। ভেঙে গেল হাঁড়ি-পাতিল। উল্টে গেল তাঁবু। ছিঁড়ে গেল রশি। আর সেই সাথে নেমে এলো হাঁড়কাঁপানো অসহনীয় শীত।

সেই এক মহাদুর্যোগ নেমে এলো কুরাইশ ছাউনিতে।

www.pathagar.com

ভয়ে কম্পমান দলপতি আবু সুফিয়ান। বললো, আর রক্ষা নেই। এখনই কেটে পড়তে হবে এখান থেকে। নইলে যুদ্ধ তো দূরের কথা, জীবনটা নিয়েও আর ফিরতে পারবো না।

কুরাইশ বাহিনী নিয়ে রাসূলের হৃদয়েও আশংকার দোলাচল। না জানি, কখন ক্ষ্যাপা হাতীর মত তারা আক্রমণ করে বসে, না জানি কখন অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমানদের ওপর। রাত গভীর হচ্ছে। ঝড়ের দাপটও তীব্রতর হচ্ছে।

রাসূল ভেবে নিলেন কিছুক্ষণ। তারপর চারপাশটা দেখে নিলেন ভাল করে। তিনি এমন একজন দুঃসাহসী যোদ্ধাকে তালাশ করছিলেন, যিনি এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে, রাতের অন্ধকারে কুরাইশদের শিবিরে গিয়ে তাদের গোপন তথ্য সংগ্রহ করে আনতে পারে।

নবীজী আর একবার তাকিয়ে দেখলেন। সাহাবীরা অপেক্ষা করছেন মহান সেনাপতির নির্দেশের। কিন্তু, না। প্রথমত তিনি কাউকে নির্দেশ দিলেন না। বরং আহবানের সূরে বললেন: 'যদি কেউ মুশরিকদের খবর নিয়ে আসতে পারে, তবে তাকে আমি কিয়ামতের দিন, আমার সাহচর্যের খোশ খবর দিচ্ছি।'

একে তো প্রচণ্ড ঝড়। তার ওপর প্রচণ্ড শীত। রাসূলের আহবানে সাহাবারা একে অপরের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছেন।

তারাও ভাবছেন।...

রাসূল একে একে তিনবার কথাটি উচ্চারণ করলেন। কিন্তু কোনো সাড়া পেলেন না। একটু থামলেন। তারপর, এবার তিনি হুজাইফার নাম ধরে ডেকে বললেন: 'হুজাইফা, তুমি যাও। খবর নিয়ে এসো।'

হযরত হুজাইফা। পুরো নাম-হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান। তখনো বেশ ভীতু এবং শীতকাতর। রাসূল তাকে জানেন খুব ভালভাবে। তারপরও এই দুঃসাহসিক কাজের জন্য তিনি তাকেই নির্বাচন করলেন।

www.pathagar.com

রাসূলের নির্দেশে তবুও খুশি হলেন হুজাইফা। তিনি যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। রাসূল দোয়া করলেন তার জন্য। বললেন, 'হে আল্লাহ! সামনে-পিছনে, ডানে-বামে, উপরে-নিচে, সবদিক থেকে তুমি তাকে হিফাজত করো।'

আশ্চর্য! রাসূলের দোয়া শেষ না হতেই হুজাইফা নিজের ভিতর এক অসীম শক্তি এবং সাহসের ফুলকি জ্বলে উঠতে দেখলেন। নিজের ভিতর অনুভব করলেন এক ভয়হীন বিশাল পর্বত।

তারপর!

হুজাইফা নিজেই বলছেন ঃ 'তারপর আমি রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে চলতে লাগলাম। এক সময় কুরাইশদের শিবিরে প্রবেশ করে তাদের সাথে এমনভাবে মিশে গেলাম যেন আমি তাদেরই একজন।

আমার পৌঁছার কিছুক্ষণ পর আবু সুফিয়ান কুরাইশবাহিনীর সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলতে চাই। তবে আমার আশংকা হচ্ছে, তা মুহাম্মদের কাছে পৌঁছে যায় কি না। তোমরা প্রত্যেকেই নিজের পাশের লোকটির দিকে খেয়াল রাখ। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর কসম! তোমরা কোনো নিরাপদ গৃহে নও। আমাদের ঘোড়াগুলি মরে গেছে। উটগুলিও কমে গেছে। আর মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরাইজাও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তাদের যে খবর আমাদের কাছে এসেছে তা মোটেই সুখকর নয়। আর কেমন প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছি, তাও তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আমাদের হাঁড়িও আর নিরাপদ নয়। আগুনও জ্বলছে না। সুতরাং, জীবন থাকতে এখনও চলো ফিরে যাই। আমি চললাম।' বলেই আবু সুফিয়ান উটের পিঠে চেপে বসলো। উটটি চলতে শুরু করলো।

সেই ভয়াবহ রাতের পুরো ঘটনাটি নবীর কাছে এসে বললেন হুজাইফা। কুরাইশবাহিনীর গোপন তথ্যগুলো জানতে পেরে রাসূল

www.pathagar.com

(সা) খুবই খুশি হলেন। ভীষণ উপকার হলো সেদিন মুসলিম বাহিনীর।

হিজরী ১৮ সন। নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ। খুব গুরুত্বপূর্ণ এক যুদ্ধ। প্রতিপক্ষ বাহিনী-পারসিক। পারসিক সৈন্যসংখ্যা ছিল দেড় লাখ। আর তার মুখোমুখি মুসলিম সৈন্য সংখ্যার পরিমাণ মাত্র তিরিশ হাজার। মুসলিম বাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্বে আছেন হযরত নুমান ইবন মুকাররিন। খলিফা হযরত ওমরের নির্দেশ।

হযরত ওমর কূফায় অবস্থানরত হুজাইফাকে চিঠি লিখলেন। চিঠিতে সেখান থেকে একটি বাহিনী নিয়ে নিহাওয়ান্দের দিকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। মুসলিম মুজাহিদদের প্রতি খলিফার ফরমান জারি করা হলো। ফরমানে খলিফা ওমর বললেন ঃ চারদিক থেকে মুসলিম সৈন্যরা যখন এক জায়গায় একত্রিত হবে তখন প্রত্যেক জায়গা থেকে আগত বাহিনীর একজন করে আমীর থাকবে। আর গোটা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন নুমান ইবন মুকাররিন। নুমান যদি শহীদ হন, তাহলে হুজাইফা হবেন পরবর্তী আমীর। আর তিনিও শহীদ হলে আমীর হবেন জারীর ইবন আবদিল্লাহ আল-বাজালী। এভাবে খলিফা সেই ফরমানে একের পর এক সাতজন সেনাপতির নাম ঘোষণা করেন।

যোগ্য সেনাপতি নুমান। তিনি নিহাওয়ান্দের অদূরে শিবির স্থাপন করে বাহিনীর দায়িত্ব বণ্টন করেন। হযরত হুজাইফা ছিলেন এই যুদ্ধের দ্বিতীয় সেনাপতি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সুতরাং হুজাইফাকে নিয়োগ করা হলো দক্ষিণভাগের অফিসার।

যুদ্ধ শুরু হলো।

ভয়ংকর এক যুদ্ধ! দেড়লাখ শত্রুসেনার মুখোমুখি মাত্র তিরিশ হাজার মুসলিম সৈন্য। এক অসম যুদ্ধ। তবুও মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ করে যাচ্ছেন সাহসিকতার সাথে। প্রাণপণে।

www.pathagar.com

যুদ্ধ চলছে। ভীষণ যুদ্ধ। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় শহীদ হলেন সেনাপতি নুমান।

শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে তিনি খলিফার নির্দেশ মোতাবেক হযরত হুজাইফাকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদানের অসিয়ত করেন। হুজাইফা সেনাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে একটু ভাবলেন। তখনও যুদ্ধ চলছে প্রচণ্ড গতিতে।

হুজাইফা আশপাশের সকলকে নিষেধ করলেন, যেন সেনাপতি নুমানের শাহাদাতের খবর অন্যরা না জানে। সেনাপতি নুমানের ভাই নুয়াঈমও ছিলেন এই বাহিনীর সাথে। হুজাইফা বুদ্ধি করে নুয়াঈমাকে নুমানের স্থলে দাঁড় করিয়ে দিলেন। যাতে করে নুমানের শাহাদাতের প্রভাব অন্যদের ওপর না পড়ে। খুব দ্রুত কাজগুলি করলেন হযরত হুজাইফা। তারপর– তারপর ঝড়ের গতিতে তিনি পারসিক বাহিনীর সামনে গিয়ে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন :

'আল্লাহু আকবার : সাদাকা ওয়াদাহ্।

আল্লাহু আকবার : নাসারা জুনদাহ্।

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ–তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন।

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ-তিনি তাঁর সিপাহীদের সাহায্য করেছেন।

হযরত হুজাইফা আর দেরি করলেন না। খুব দ্রুত তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে টান মেরে শত্রুবাহিনীর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর মুসলমান যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন : 'হে মুহাম্মাদের অনুসারীরা! এখানে, এদিকে জান্নাত তোমাদের স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তোমরা আর দেরি করো না। হে বদরের যোদ্ধারা! যোদ্ধারা! ছুটে এসো।

হে খন্দক, উহুদ ও তাবুকের বীরেরা! সামনে এগিয়ে চলো।'

নিহাওয়ন্দের যুদ্ধে হুজাইফার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর জয় সূচিত হয়। হযরত হুজাইফার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসিকতায় একে একে অনেকগুলো দেশ মুসলমানদের অধিগত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

শুধু এখানেই নয়। এরপরও বহু যুদ্ধে হুজাইফা অংশগ্রহণ করেন। আর প্রতিটি যুদ্ধে তিনি দেখান অপরিসীম সাহস, হেকমত এবং অভিনব রণকৌশল।

হুজাইফা ছিলেন মাদায়েনের ওয়ালী বা শাসক। কিন্তু শাসক হলে কি হবে, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন আড়ম্বরহীন খুব সাধারণ একজন মানুষ।

মৃত্যুর আগে, হুজাইফা আরও বেশি সাধারণ জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। শেষ জীবনে তিনি হয়ে পড়েছিলেন আল্লাহর ভয়ে আরও বেশি ভীতসন্ত্রস্ত। সব সময় কান্নাকাটি করতেন।

কিন্তু কেন? সবাই জিজ্ঞেস করতেন। হুজাইফা জবাবে শান্তভাবে বলতেন, 'দুনিয়া ছেড়ে যাবার জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। দুনিয়ার মায়ায় আমি কাঁদছিনে। কারণ, মৃত্যু আমার অতি প্রিয়। তবে এ জন্য কাঁদছি যে, মৃত্যুর পর আমার অবস্থা কী হবে! কী হবে আমার পরিণতি! হায়! আমি তো এসবের কিছুই জানি না।

মৃত্যুর সময় প্রায় উপস্থিত।

রাতের বেলা কয়েকজন সাহাবী দেখতে এলেন তাঁদের প্রিয় বন্ধু হযরত হুজাইফাকে। হুজাইফা তাদের কাছে জানতে চাইলেন, এটা কোন সময়? প্রভাতের কাছাকাছি। তারা জবাব দিলেন।

আমি সেই সকালের ব্যাপারে আল্লাহর পানাহ চাই-যা আমাদের জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এই কথাটি তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি কাফন এনেছেন?

তারা বললেন, হ্যা এনেছি।

তিনি বললেন, কাফনের ব্যাপারে বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। কারণ, আল্লাহর কাছে যদি আমার কিছু ভালো থেকে থাকে তাহলে এ কাফন পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। আর যদি খারাপ থাকে তাহলে এ ভালো কাফন ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

www.pathagar.com

হযরত হুজাইফা কাফন দেখতে চাইলেন। সাথীরা একটি কাফন তার সামনে মেলে ধরলেন। হুজাইফা খুব ধীর স্থির ভাবে তাকালেন কাফনটির দিকে। তারপর একটি বিদ্রূপের হাসি দিয়ে বললেন, 'এ কাফন আমার নয়। কেননা এটা নতুন এবং অনেক দামী। আমার জন্য কামিস ছাড়া দুপ্রস্থ সাদা কাপড়ই যথেষ্ট। কারণ কবরে আমাকে বেশি সময় বিরতি দেওয়া হবে না খুব তাড়াতাড়ি আমাকে তার চেয়ে ভালো অথবা মন্দ স্থানে নেওয়া হবে। এ কথা বলার পর হযরত হুজাইফা দোয়া করলেন : 'হে আল্লাহ! তুমি তো জান, আমি ধনের চেয়ে দারিদ্র্যকে, ইজ্জতের পরিবর্তে জিল্লতীকে এবং জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুকে ভালোবাসতাম।'

হযরত হুজাইফা ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু, বিনয়ী এবং কর্তব্যপরায়ণ। অন্যের হক বা অধিকারের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ। নিজের সুখসম্ভোগের দিকে ছিলেন কেবল উদাসীন। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি ছিলেন একান্ত অনুগত। তার হৃদয় জুড়ে ছিল আল্লাহ রাসূল (সা) এবং ইসলামের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা। নিজেকে তিনি কুরবান করেছিলেন আল্লাহর পথে। পার্থিব লোভ লালসা এমন কি কোনো রকম স্বার্থ তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। মৃত্যুর সময়ে তার জন্য বন্ধুদের বয়ে আনা দামী কাফন দেখে তিনি যেমনি বিস্মিত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ভেতরে ভেতরে কেঁদেও উঠেছিলেন। সেই কান্না ছিল তাঁর আল্লাহর কাছে পৌঁছুবার জন্য আর এক অজানা আশংকার কান্না : 'হায়! পরপারে আমার অবস্থা কী হবে? কেমন হবে?' তাঁর সেই অদৃশ্য কান্নার পানিতে ভিজে গেল ধবধবে সফেদ কাফন। ভেজা কাফনটি জড়িয়ে ধরে আবারও হু হু করে কেঁদে উঠলেন এক অসাধারণ সাহসী সাহাবী–হযরত হুজাইফা।

www.pathagar.com

কিশোর কমান্ডার

হযরত উসামা ইবন জায়িদ (রা)!
শৈশবে লালিত-পালিত হয়েছেন রাসূলের ঘরে। রাসূল প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন শিশু উসামাকে। এমন সৌভাগ্য আর কয়জনের ভাগ্যে জোটে? শুধু কি শৈশব?
না। যৌবনেও রাসূলের প্রাণ নিংড়ানো ভালবাসা পেয়েছিলেন হযরত উসামা।
কি সৌভাগ্য তার!
স্বয়ং রাসূল তাকে উপহার দিলেন তাঁরই ব্যবহৃত একটি চাদর।
অপূর্ব পুরস্কার!
কি চমৎকার উপঢৌকন!
হযরত উসামা ছোটকাল থেকেই ছিলেন অপরিসীম সাহসী। আর যুদ্ধের জন্য ছিলেন পাগলপারা।
ওদিকে বেজে উঠেছে উহুদের যুদ্ধের দামামা। তখন নিতান্তই কিশোর হযরত উসামা।
সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।
দেখছেন এক কিশোর ব্যাকুল দৃষ্টিতে।
আবেগভরা কচি হৃদয়ে।
কচি কিন্তু কঠিন পাথরের মত তার বিশ্বাস।
মা পরামর্শ করলেন কয়েকজন কিশোর বন্ধুর সাথে।

www.pathagar.com

তারাও যুদ্ধে যাবার জন্য উদগ্রীব।

কম্পিত হৃদয়ে দাঁড়ালেন কিশোর উসামা রাসূলের সামনে।

সাথে আছেন কিশোর বন্ধুরা। উদ্দেশ্য রাসূলের সম্মতির প্রার্থনা।

রাসূল তাদের দেখে একটু মুচকি হাসলেন।

কিন্তু ভেতরে তাঁর গভীর বিস্ময়!

এতটুকু ছেলেরা যুদ্ধে যেতে চায়! কম কথা নয়। তবুও বাস্তব বলে কথা।

রাসূল উসামাসহ কিশোরদের অধিকাংশকে ফিরিয়ে দিলেন।

এত কম বয়সে যুদ্ধে যাওয়া ঠিক নয়।

ফিরে এলেন উসামা।

চোখ দুটি তার বেদনার পানিতে টলমল করছে।

বুকে ঢেউ খেলে যাচ্ছে কষ্টের দরিয়া।

উহুদ গেল। এলো খন্দকের যুদ্ধ।

আবার রাসূলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন হযরত উসামা।

আবারও যদি ছোট বলে বাদ দিয়ে দেন রাসূল!

ভয় আর শংকায় দুলে উঠলো কিশোর মন। বের করলেন এক অভিনব কৌশল। রাসূল যেন তাকে বাদ না দেন, এজন্য উসামা পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর রেখে যতটুকু সম্ভব লম্বা করলেন শিরদাড়া। এখন তাঁকে বেশ উঁচু মনে হচ্ছে।

রাসূল এবার আর তাকে বাদ দিলেন না।

যুদ্ধে যাবার অনুমতি পেয়ে সেকি উল্লাস কিশোর উসামার।

তাঁর বয়স তখন বার কি তের।

ঠিক তার উচ্চতার সমান লম্বা তরবারি, কাঁধে ঝুলিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন কিশোর উসামা।

আর মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে, 'হারকা' অভিযানের নেতৃত্বের ভার রাসূল তুলে দেন, বুদ্ধিদীপ্ত-সাহসী যোদ্ধা উসামার হাতে।

www.pathagar.com

এটাও একটা বিরল ইতিহাস।

মূতার যুদ্ধ।

সেনাপতি-স্বয়ং পিতা-জায়িদ ইবন হারিসা। যুদ্ধ চলছে তীব্রগতিতে।

একসময় এই যুদ্ধে শহীদ হলেন সেনাপতি জায়িদ ইবন হারিসা। উসামা নিজের চোখে দেখলেন প্রাণপ্রিয় পিতার নির্মম শাহাদাতের করুণ দৃশ্য।

কিন্তু কি আশ্চর্য!

একটুও ভেঙে পড়লেন না উসামা।

এতটুকুও বিচলিত হলো না তার হৃদয়। হৃদয়ের শোককে তিনি দ্রুত পরিণত করলেন শক্তিতে।

এবং তারপর।

তারপর একসময় সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে তিনি অসীম সাহসীকতার সাথে যুদ্ধ করে রোমান বাহিনী থেকে মুক্ত করলেন মুসলিম বাহিনীকে।

আর যুদ্ধ শেষে-যে ঘোড়ার ওপর শহীদ হয়েছিলেন সেনাপতি পিতা-জায়িদ ইবন হারিসা-ঠিক সেই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তিনি ফিরে এলেন মদীনায়।

একাদশ হিজরী।

উসামার বয়স তখন বিশেরও কম।

রোমানরা চারদিকে থেকে শুরু করেছে উৎপাত।

তাদের সমুচিত জবাব দেবার জন্য রাসূল তৈরি হতে বললেন মুসলিম মুজাহিদদের।

আর এই অভিযানের সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করলেন কমবয়সী এক যুবক–হযরত উসামাকে।

সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন কমান্ডার যুবক।

www.pathagar.com

এদিকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন দয়ার নবী এবং ইন্তিকালও করলেন। খলিফা নির্বাচিত হলেন হযরত আবু বকর। কিন্তু তবুও রাসূলের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন তিনি।

বললেন, রাসূল যাকে নিযুক্ত করে গেছেন তিনিই থাকবেন রোমান অভিযানের কমান্ডার। রাসূলের ইন্তিকালের পর যুবক কমান্ডারের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পৌছে গেলেন রোমানে।

আবুবকর তাঁদেরকে কিছুদূর এগিয়ে দেবার জন্য চললেন বাহিনীর সাথে।

উসামা ঘোড়ার পিঠে আর আবু বকর চলছেন পায়ে হেঁটে।

একসময় উসামা বিনয়ের সাথে আরজ করলেন, হে রাসূলুল্লাহর খলিফা! আল্লাহর কসম, হয় আপনি ঘোড়ায় উঠুন, না হয় আমি নেমে পড়ি।

খুব মিষ্টি করে হেসে বললেন খলিফা হযরত আবুবকর :

আল্লাহর কসম! তুমিও নামবে না, আমিও ঘোড়ার পিঠে উঠবো না। কিছুক্ষণ আল্লাহর পথে আমার পদযুগল ধূলি মলিন হতে দোষ কি?

তারপর একটু থেমে আবার বললেন :

তোমার দীন, তোমার আমানতদারী এবং তোমার কাজের সমাপ্তি আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) যে নির্দেশ তোমাকে দিয়েছেন, তা কার্যকরী করার উপদেশ তোমাকে দিচ্ছি।

তারপর উসামার দিকে একটু ঝুঁকে তিনি বললেন, উসামা! তুমি যদি ওমরের দ্বারা আমাকে সাহায্য করা ভাল মনে কর, তবে তাকে আমার কাছে থেকে যাবার অনুমতি দাও।

খলিফা হযরত আবু বকরের কথা শুনে উসামা বললেন :

ঠিক আছে, তাই হোক।

www.pathagar.com

আনুগত্যের কি চমৎকার নিদর্শন!

রোমান অভিযানে সফল হলেন কমান্ডার উসামা। রাসূলের আদেশ তিনি পালন করেন অক্ষরে অক্ষরে।

তার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পদানত করেন ফিলিস্তিনের বালকা এবং কিলায়াতুত দারুম সীমান্ত।

এই অভিযানের ফলে মুসলমানের হৃদয় থেকে চিরতরে দূর হয়ে যায় রোমান ভীতি।

আর গোটা সিরিয়া মিসর ও উত্তর অফ্রিকাসহ কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ'ভাগের বিজয়দ্বার খুলে যায় চমৎকারভাবে।

এই অভিযানেই হযরত উসামা হত্যা করেন তার পিতার হত্যাকারীকে।

এবং তারপর যে ঘোড়ার পিঠে শহীদ হয়েছিলেন তার পিতা, সেই ঘোড়ার পিঠে বহন করে আনলেন বিপুল পরিমাণে গণিমতের মাল।

যোগ্য প্রতিশোধই বটে।

হযরত উসামা! যার ছিল একটি অনাড়ম্বর অথচ বর্ণাঢ্য জীবন।

ছিল গভীর প্রজ্ঞা, সাহস আর আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের প্রতি অঢেল ভালবাসা।

যে ভালবাসা, প্রজ্ঞা আর সাহসের কারণে খুব কম বয়সে সেই কৈশোরেই তিনি পেয়েছিলেন নবীজীর কাছ থেকে কমান্ডারের মত এত বিরল মর্যাদা।

www.pathagar.com

আলোর মিছিল

সূর্য ডুবে গেছে।......
সত্য আর সুন্দর হয়েছে নির্বাসিত। চারদিক থক থক করছে জমাটবাধা অন্ধকার।
জাহেলিয়াতের সয়লাবে ভেসে গেছে আরবের সকল সমাজ।
মানুষের চোখে আশা নেই। স্বপ্ন নেই। নেই মুক্তির দিশা।
ঠিক এমনি সময়ে আবির্ভূত হলেন মানবতার মহান পুরুষ-নবী মুহাম্মাদ (সা)।
তখনো নবুওয়তপ্রাপ্ত হননি হযরত মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ পাক সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁকে সম্মানিত করবেন।
রাসূল (সা) লোকালয় ছেড়ে চলে যেতেন মক্কার পাবর্ত্য উপত্যকা ও সমভূমিতে।
রাসূল যে পথ দিয়ে হাঁটতেন সেই পথের দুপাশ থেকে পাথর এবং বৃক্ষলতা সমস্বরে বলে উঠতো-
"আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।"
"হে আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি সালাম।"......
ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান রাসূল ডানে এবং বামে। সামনে এবং পেছনে। না, কেউ নেই।

www.pathagar.com

বৃক্ষ ছাড়া, পাথর ছাড়া, পাহাড় পর্বত, উট এবং মেষের পাল আর মরুভূমির উত্তপ্ত বালু ছাড়া চারপাশে কেউ নেই।
কারুর অস্তিত্ব খুঁজে পান না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
তবু, তবু এ কিসের শব্দ? কার পক্ষ থেকে এ কোন অলৌকিক ধ্বনি? বিস্ময়ে চমকে ওঠেন নবী মুহাম্মদ (সা)!
এভাবে কেটে গেল কিছু দিন।
রাসূল ভাবেন আনমনে। একান্তে। নির্জনে। চিন্তা তাঁকে টেনে নিয়ে যায় মক্কা থেকে কিছু দূরে–হেরা গুহায়।
হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন রাসূল।
তিনি ভাবেন-বিশ্বজাহান এবং জীবন-মৃত্যুর রহস্য নিয়ে।
কে? কে সৃষ্টি করেছেন আমাকে? এই-আকাশ, পৃথিবী, এই সুন্দর প্রকৃতি আর এই চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার প্রকৃত মালিক কে?
কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসার ঢেউ আছড়ে পড়ছে নবীজীর কোমল হৃদয়ে।
রমজান মাস। রাসূল হেরাগুহায় একাকী। ধ্যানমগ্ন। হঠাৎ তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন এক আলোকিত ফেরেশতা-হযরত জিবরাইল। তাঁর হাতে একখণ্ড রেশমি কাপড়। তাতে লেখা ছিল কিছু। কাপড়টি রাসূলের সামনে তুলে ধরে জিবরাইল বললেন-
'ইক্বরা'।...পড়ুন।
অবাক মুহাম্মদ! কাঁপাস্বরে বললেন, 'আমিতো পড়তে জানি না।'
জিবরাইল এবার চেপে ধরলেন নবী মুহাম্মদকে (সা)। বললেন, 'পড়ুন'।
তৃতীয়বার চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বললেন জিবরাইল-
'ইক্বরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক'।.......
"পড়ুন আপনার সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন। এবং আপনার রব অতীব

www.pathagar.com

অনুগ্রহশীল। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন সবকিছু শিখিয়েছেন যা মানুষ জানতো না।" (আল আলাক)

চলে গেলেন হযরত জিবরাইল। থরথর করে কেঁপে উঠলেন নবী মুহাম্মদ (সা)!

এ কিসের আওয়াজ? কিসের শব্দ?

এটাই মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী মুহাম্মদের কাছে প্রথম বাণী। প্রথম ওহী।

প্রথম ওহীর ছয়মাস পর। কোথাও যাচ্ছেন নবী মুহাম্মাদ (সা)। হঠাৎ ওপরের দিকে ধ্বনিত হলো-একটি আওয়াজ।

ভীষণ আওয়াজ! মাথা তুলে ওপরে তাকালেন হযরত। দেখলেন জিবরাইলকে। যার ডানাগুলো ছিল আদিগন্ত বিস্তৃত।

এই দৃশ্য দেখে আবারো কেঁপে উঠলেন তিনি। দ্রুত ফিরে এলেন বাড়িতে।

খাদিজাকে (রা) ডেকে বললেন, "যাম্মিলূনী, যাম্মিলূনী"।

কম্বল জড়িয়ে দেয়া হলো নবী মুহাম্মাদকে (সা)। এই অবস্থার মধ্যেই জিবরাইল আবার চলে আসেন নবীর (সা) কাছে এবং পৌঁছে দেন দ্বিতীয় ওহীর বাণী—

"ইয়া আইয়ুহাল মুদাস্সির। কুম ফা আনজির......."

"ওহে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি, ওঠো। লোকদের সাবধান করো। এবং তোমার রবের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করো এবং তোমার পোশাক পাক সাফ করো এবং মলিনতা থেকে দূরে থাকো এবং বেশী পাওয়ার জন্য ইহসান করো না এবং তোমার রবের খাতিরে ধৈর্য অবলম্বন করো।" (আল মুদাসসির)

দ্বিতীয় ওহীতে স্পষ্ট হলো রাসূলের (সা) কাছে—মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে হবে।

www.pathagar.com

তাদের কাছে মহান রাব্বুল আলামিনের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে হবে। এবং একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন পবিত্রতা, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতা।

ওহীর এই মর্মবাণী বুঝার পর নবী মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর নির্দেশে শুরু করলেন দাওয়াতের কাজ। ইসলাম প্রচারের কাজ।

প্রথমে শুরু করলেন নিজের ঘর থেকে।

তারপর পড়শীর ভেতর। ঘনিষ্ঠ জনদের মধ্যে। চুপে চুপে। গোপনে।

রাসূলের (সা) ডাকে সাড়া দিলেন বেশকিছু মর্দে মুজাহিদ। যারা জান-মাল এবং সকল কিছুর বিনিময়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পর্বত সমান।

এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এলো প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ।

সাফা পাহাড়ে উঠে মক্কাবাসীদেরকে ডাকলেন রাসূল– ইয়া সাবাহা!.........

রাসূলের (সা) সংকেতবাণী শুনে ছুটে এলো তারা। তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন–

"হে ধ্বংস পথের যাত্রীদল! হুশিয়ার হও। এখনো সময় আছে। এখনো পথ আছে। ফিরে এসো আলোর পথে। সুন্দরের পথে। ইবাদত করো এক আল্লাহর। পবিত্র করো অন্তরকে। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের কল্যাণ হবে।"

বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়লো রাসূলের দাওয়াত। খেজুরের বাগান থেকে সচকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তৃষিত শ্রমিক। 'কে যায়? প্রদীপ হাতে কে যায়, ওগো কারা?'

আলোর মিছিল নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলেছেন নবী মুহাম্মাদ।

www.pathagar.com

তাঁর মিছিলে একে একে যোগ দেন-চিন্তাশীল সত্যানুরাগী মানুষ। বঞ্চিত ও শোষিত মানুষ। লাঞ্ছিতা নারী।

আলোর পরশ পেয়ে তারাও হয়ে উঠলো খাঁটি। সত্য মানুষ। এভাবে দলে দলে লোক ছুটে আসে সেই আলোকিত মিছিলের দিকে। রাসূলের (সা) দিকে। সত্যের দিকে।

কিন্তু ততোক্ষণে জ্বলে উঠেছে আবু জেহেলের বুক।

প্রতিশোধের আগুন লক লক করে উঠছে কাফেরদের চোখে মুখে।

শুরু হলো অত্যাচার।

একে একে শহীদ হলেন হারেস ইবনে আবিহালা, ইয়াসির, খোবাইব প্রমুখ সাহাবী।

শুধু পুরুষ নয়, রাসূলকে ভালবেসে হাসতে হাসতে খোদার পথে শহীদ হলেন দুঃসাহসী এক মহিলা–হযরত সুমাইয়া।

ইসলাম প্রচারের একেবারেই প্রথম দিককার কথা।

তখন যারা ইসলাম কবুল করতেন, তাদের ওপর কাফেররা চালাতো অকথ্য নির্যাতন।

তাদের অত্যাচারে কেঁপে উঠতো আল্লাহর আরশ। ভারী হয়ে উঠতো বাতাসের বুক।

থেমে যেত পাখির কলরব।

কিন্তু ঈমানের পরীক্ষায় তারা হতেন উত্তীর্ণ।

এমনি একজন সফল মায়ের নাম-হযরত সুমাইয়া।

ইসলাম গ্রহণের কারণে কুরাইশদের হাতে শহীদ হয়ে গেছেন তাঁর স্বামী-হযরত ইয়াসির।

শহীদ হযেছেন তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র-হযরত আবদুল্লাহ।

এবার কাফেরদের হিংস্র চোখ পড়লো সুমাইয়ার ওপর। লোহার পোশাক পরিয়ে সুমাইয়াকে তারা দাঁড় করিয়ে দিত মরুভূমির ঠা ঠা রোদের ভেতর। উত্তপ্ত বালুর ওপর।

www.pathagar.com

...।....বলে চিৎকার করলেও নরপশুরা এক ফোঁটা পানি ...ত না তাঁকে।

তখনো ঈমানের ওপর পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন হযরত সুমাইয়া।

ক্ষিপ্ত কুরাইশ! অবশেষে বর্শার আঘাতে আঘাতে তারা ঝাঝরা করে দিল হযরত সুমাইয়ার পবিত্র শরীর। আর এভাবেই তিনি পান করলেন শহীদী পেয়ালা।

হযরত খাব্বাবের কথা কে না জানে?

তাঁর ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছিল তা দেখে শিউরে উঠেছিল সমগ্র জাহান। থেমে গিয়েছিল উঠের বহর। ছলছল করে উঠেছিল প্রকৃতির চোখ।

শুধু একজন খাব্বাব নয়। কত যে খাব্বাব এভাবে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের জীবন। একমাত্র নবীকে (সা) ভালবেসে। আল্লাহকে ভাল বেসে। আল্লাহর দীনকে ভালবেসে।

নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বছর।

ছাফা থেকে বের হলো মুসলমানদের একটি মিছিল।

ইসলামের পক্ষে প্রথম মিছিল। মিছিলের দুই লাইনের সামনে ছিলেন। হযরত হামযা এবং হযরত ওমর (রা)। আর উভয়ের মাঝে ছিলেন স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)।

কাবায় গিয়ে শেষ হলো মিছিলটি।

মিছিলের সবার মুখে সেদিন উচ্চারিত হলো এক অনুপম ধ্বনি-

'আল্লাহু আকবার।'......

কিন্তু তারপর।....

তারপর মুশরিকদের অত্যাচার আর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেল শতগুণে। তাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে বহু মুসলিম হাবশায় চলে যেতে বাধ্য হলেন।

www.pathagar.com

নবুওয়তের ৭ম বছর। মক্কার সকল গোত্র সমাজ থেকে বয়কট করলো বনু হাশিম গোত্রকে। তাদের সাথে সকলের লেন-দেন ব্যবসা বাণিজ্য, কথা বার্তা বন্ধ করে দিলো। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গড়িয়ে গেল। কেটে গেল এভাবে মাসের পর বছর। তাদের কাছে যে খাদ্যদ্রব্য মজুত ছিল, একদিন তাও ফুরিয়ে গেল। ক্ষুধার জ্বালায় তারা গাছের পাতা খেতে শুরু করলেন। গাছের পাতাও একদিন শেষ হয়ে গেল। তখন তারা গাছের ছাল খাওয়া শুরু করলেন। গাছের ছালও এক সময় শেষ হয়ে গেল। তাদের তাঁবুগুলো ছিল উটের চামড়ার তৈরি। ক্ষুধার জ্বালায় তারা তাঁবুর এক একটি অংশ ছিঁড়ে সেই উঠের চামড়া চিবিয়ে খেতে শুরু করলো। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। ক্ষুধায় মারা গেলেন অনেকে।

এভাবে তারা অসহ্য কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করলেন তিনটি বছর।

নবুওয়াতের নবম বছর।

মক্কার মুশরিকদের অত্যাচার আর উৎপীড়নে অস্থির হয়ে উঠলো সাধারণ মানুষ। রাসূল (সা) ভাবলেন, এখানে আর নয়। এবার যেতে হবে তায়েফ। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি যাত্রা করলেন তায়েফের দিকে।

মক্কা থেকে ষাট মাইল দূরে তায়েফ।

সবুজ-সুন্দর তায়েফের প্রকৃতি। কিন্তু সেখানে গিয়েও সুস্থির হতে পারলেন না নবী মুহাম্মাদ (সা)। রাসূল তাদেরকে ডাকেন-হে তায়েফবাসী! তোমরা চলে এসো আলোর পথে। সত্যের পথে। রাসূলের দিকে।

অবোধ তায়েফবাসী! তারা শুনলো না নবীর (সা) কথা।

তাঁর আহবানে সাড়া না দিয়ে বরং তায়েফবাসীরা নবীর ওপর চালালো অকথ্য নির্যাতন। তাদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হলেন

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মাদ (সা)! তবুও দয়ার নবী দুহাত তুলে দোয়া করলেন তাদের জন্য।

শত অত্যচার আর আঘাতেও হতাশ হলেন না নবী মুহাম্মাদ (সা)। হতাশ হলেন না তাঁর প্রিয় সাথীরা।

কিছুদিন পর। ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেল মদীনায়।

মদীনা থেকে কুবা পর্যন্ত প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেল ইসলামের আহ্বান। প্রথমে চারজন মদীনাবাসী মুহাম্মাদের (সা) কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করলেন বাহাত্তর জন।

ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য মক্কার পরিবেশ চলে গেল প্রতিকূলে। আর ধীরে ধীরে মদীনার পরিবেশ হয়ে উঠলো উর্বর।

মদীনার মানুষ ছিল ইসলামের জন্য উন্মুখ। ফলে রাসূল (সা) সিদ্ধান্ত নিলেন মদীনায় হিজরত করার।

রাসূল হিজরত করলেন মদীনায়। পেছনে পড়ে রইলো তাঁর আপন জন্মভূমি মক্কা।

পড়ে রইলো চেনা-জানা মরুপথ, খেজুরের বাগান, পাহাড়, উপত্যকা আর মরুভূমি-মরুদ্যান। বারবার তিনি অশ্রুসক্ত চোখে তাকান মক্কার দিকে। প্রিয় জন্মভূমির দিকে।

রাসূলের (সা) বিদায়ে কেঁদে উঠলো মক্কার উঠ ভেড়া আর মেষের পাল। পাথরের বুকও ভিজে গেল। কিন্তু বুঝলো না কেবল মক্কার পাপিষ্ঠ মানুষ।

রাসূল কংকর আর উত্তপ্ত বালুর পথ অতিক্রম করে পৌঁছে গেলেন মদীনায়।

মদীনাবাসীরা প্রিয় নবীর আগমনে ধন্য হয়ে সমস্বরে গেয়ে উঠলো–

"তালাআল বদরু আলাইনা
মিন সানিয়াতিল বিদাঈ

www.pathagar.com

ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা
মাদাআ লিল্লাহি দাঈ।"

আটই রবিউল আউয়াল।

মদীনা থেকে তিন মাইল দক্ষিণে কুবা পল্লীতে উপস্থিত হলেন নবী মুহাম্মাদ (সা)।

কুবায় স্থাপন করলেন রাসূল মুসলমানদের প্রথম মসজিদ এবং এই মসজিদেই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো সালাতুল জুমআ।

মদীনাতেই গড়ে তোলেন রাসূল (সা) মসজিদে নববী।

মদীনা হলো-নগর রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র।

এখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ইসলামী রাষ্ট্র। কিন্তু ক্ষেপে গেল কাফির মুশরিকরা। পৃথিবীর প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রটি ধ্বংস করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো তারা।

ফলে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ।........

মাত্র তিন শো তের জন মুজাহিদ এগিয়ে চললেন বদর প্রান্তর। সেনাপতি-স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ (সা)।

কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা এক হাজার। তবুও আল্লাহর সৈনিকেরা বিজয় লাভ করলেন বদরের যুদ্ধে। কেবল বদর নয়।

এভাবে রাসূলকে (সা) মুকাবিলা করতে হলো ওহোদ, খন্দক, খাইবার, তাবুক, হোনাইন মূতা-সহ অনেকগুলো যুদ্ধ। প্রতিটি যুদ্ধই ছিল সত্য আর মিথ্যার। এবং প্রতিটি যুদ্ধেই অসীম সাহসের সাথে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন রাসূলসহ তাঁর সংগ্রামী দুর্ধর্ষ কাফেলা।

এভাবেই জিহাদ ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একদিন (১০ই রমজান, অষ্টম হিজরীতে) রাসূল (সা) বিজয় করলেন মক্কা।

মক্কা বিজয়ের পর। যারা, যে মক্কাবাসীরা একদিন অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছিল নবীর ওপর। তাঁর সাথীদের ওপর।

www.pathagar.com

তাদের জন্য নবী মুহাম্মাদ (সা) ঘোষণা করলেন সাধারণ ক্ষমা। রাসূলের মহত্বে মক্কাবাসীরা অনুতপ্ত হলো। দলে দলে তারা নবীর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। পাঠ করলো তারা প্রশান্ত হৃদয়ে–'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

মক্কা বিজয়ের পর।

নবী মুহাম্মাদ প্রবেশ করলেন পবিত্র কাবায়। কাবার ভেতর রক্ষিত মূর্তির দিকে ছড়ি উঁচিয়ে রাসূল পাঠ করলেন-

"জাআল হাক্কু ওয়া জাহাকাল বাতিলু, ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা.......।"

তারপর–তারপর বহু ত্যাগ তিতীক্ষা, বহু জিহাদ ও রক্তের বিনিময়ে একদিন রাসূল (সা) প্রতিষ্ঠা করলেন তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ, শোষণহীন অর্থনীতি, জুলুমহীন রাজনীতি এবং সুন্দর ও সুস্থির একটি পরিবেশ।

ইসলামের শান্তি ও কল্যাণের পরশ পেয়ে হেসে উঠলো মানবতা। হেসে উঠলো সমগ্র পৃথিবী। আর এভাবেই একদিন পূর্ণ হলো মহানবীর (সা) মহান আন্দোলনের এক বিশাল জীবন।

ধ্বনিত হলো প্রিয় নবীর (সা) কণ্ঠে মহান রাব্বুল আলামিনের সর্বশেষ বাণী–

"আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আত্মামতু আলা'ইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলামা দীন।"

"আজ তোমাদের জন্য আমার দীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করলাম। দীন হিসাবে ইসলামকে আমি মনোনীত করলাম।"

www.pathagar.com

উড়ন্ত শহীদ

জাফর ইবন আবু তালিব।

সাহসের এক জীবন্ত আগ্নেয়গিরি।

অষ্টম হিজরী।

সিরিয়ার রোমান বাহিনীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে গেছে। তাদের অত্যাচার আর নিপীড়নের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেছে অতীষ্ঠ সেখানকার মানুষ।

রাসূল (সা) ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর দ্রুত প্রস্তুত হতে বললেন নিজের সেনা বাহিনীকে।

উদ্দেশ্য রোমান বাহিনীকে আক্রমণ করা।

রাসূলের নির্দেশ!

প্রধান সেনাপতির হুকুম!

মুহূর্তেই প্রস্তুত হয়ে গেল একটি সুসজ্জিত সেনাবাহিনী। বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন যায়িদ বিন হারিসাকে।

তারপর তাদেরকে বললেন রাসূল ঃ

যায়িদ নিহত বা আহত হলে আমীর হবে জাফর ইবন আবু তালিব।

জাফর নিহত বা আহত হলে আমীর হবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা।

আর সে নিহত বা আহত হলে মুসলমানরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করবে।

www.pathagar.com

গভীর মনোযোগের সাথে শুনলেন তারা প্রধান সেনাপতির নির্দেশ। তারপর যাত্রা করলেন সিরিয়ার পথে।

জর্দানের সিরিয়া সীমান্তে 'মুতা' নামক স্থানে পৌঁছে গেল মুসলিম বাহিনী।

তারা তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। সতর্ক দৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত কিছুই আর গোপন থাকলো না। তারা দেখলেন এক লাখ রোমান সৈন্য তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। পেছনে আছে আরবের লাখম, জুজাম, কুদাআ প্রভৃতি গোত্রের আরও একলাখ খ্রীষ্টান সৈন্য। তারাও যুদ্ধের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান।

সৈন্যের বহরে বিশাল প্রতিপক্ষ। দুই লক্ষেরও অধিক তাদের সৈন্যসংখ্যা।

বিপুল তাদের আয়োজন ও সাজ সরঞ্জাম।

অপরদিকে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র তিন হাজার। নিতান্তই নগণ্য।

অসম এক যুদ্ধ!

কিন্তু সংখ্যায় কম হলে কি হবে?

মুসলমানদের বুকে আছে ঈমানের বল। সাহসের স্ফুলিঙ্গ তাদের চোখে মুখে। পাজর উপচে পড়ছে বিশ্বাসের দাবানল।

কলিজার দুপাশে লেপ্টে আছে আল্লাহ এবং রাসূলের (সা) ভালবাসা। শংকা কিসের?

আর দেরি নয়। দুশ্চিন্তা নয়।

মুহূর্তেই রোমান সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুসলিম বাহিনী। যুদ্ধ চলছে। তুমুল যুদ্ধ।

যুদ্ধ শুরু হতেই বীরের ন্যায় শাহাদাত বরণ করলেন সেনাপতি যায়িদ। যায়িদের ঘোড়াটি তখন সেনাপতি শূন্য। মুহ্যমান। ছুটাছুটি করছে দিকভ্রান্ত হয়ে। শোকাহত যুদ্ধের ময়দানে।

www.pathagar.com

যায়িদের ঘোড়াটি যেন শত্রুরা ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য সতর্ক হলেন জাফর বিন আবু তালিব। তিনি নেমে পড়লেন তার ঘোড়া থেকে এবং তারপর।

তারপর নিজের তরবারি দ্বারা হত্যা করলেন যায়িদের ঘোড়াকে।

তারপর মুসলিম বাহিনীর পতাকাটি নিজের দায়িত্বে তুলে ছুটে চললেন শত্রুর মোকাবেলায়।

চারদিকে কেবল তরবারির ঝন্ ঝন্ শব্দ। সূর্যের প্রখর কিরণে তরবারির রূপালি ধার এক ধরনের কম্পন তুলছিল।

কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই কারুর। তারা এখন যুদ্ধে মগ্ন।

মসলিম বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব নিয়েছেন জাফর ইবন আবু তালিব। তিনি অসীম সাহসিকতার সাথে লড়ে যাচ্ছেন।

নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে।

রোমান সৈন্যদের মস্তক গুড়িয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন দুঃসাহসী সেনাপাতি জাফর ইবন আবু তালিব।

ততোক্ষণে শত্রুর তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে জাফরের ডান হাত।

কিন্তু থামেন না জাফর।

ডান হাত কেটে পড়ার পর তিনি পতাকা তুলে ধরেন বাম হাতে। উঁচু করে। আরও শক্তভাবে।

বাম হাতও রক্ষা পেল না শত্রুর আঘাত থেকে। তাদের ধারালো তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল জাফরের বাম হাত।

তবুও থামলেন না সেনাপতি জাফর।

এবার তিনি বাহুর সাহায্যে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন মুসলিম বাহিনীর গৌরবদীপ্ত পতাকা। সমুন্নত রাখলেন রাসূলের (সা) দেয়া পবিত্র ইসলামী ঝাণ্ডা।

কিছুক্ষণ চললো এভাবে। তারপর!-

www.pathagar.com

তারপর শত্রুর তরবারির আর একটি আঘাতে এবার দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল সাহসী সেনাপতি জাফরের পবিত্র দেহ।

জাফরের শাহাদাতের পর পতাকাটি তুলে নেন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা।

যুদ্ধ করতে করতে তিনিও শহীদ হলে মুসলিম বাহিনীর মর্যাদার প্রতীক, পবিত্র পতাকাটি সাহসের সাথে হাতে তুলে নেন দুঃসাহসী সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ। এবং তিনিই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে, নেতৃত্ব দিয়ে রোমান সৈন্যদেরকে পরাজিত করেন।

আর বিজয় ছিনিয়ে আনেন মুসলমানদের জন্য।

যুদ্ধ শেষ।

খুঁজে বার করে আনা হলো জাফরের ক্ষত-বিক্ষত দেহ।

আবদুল্লাহ ইবন ওমরও ছিলেন এই যুদ্ধে। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বলেছেন, জাফরের গায়ে তালাশ করে দেখা গেল, শুধু সামনের দিকেই পঞ্চাশটি তরবারির আঘাতের চিহ্ন। জাফরের সারা দেহে নব্বইটিরও বেশি ক্ষত চিহ্ন ছিল। কিন্তু আশ্চর্য!

এত আঘাতের একটিও তার পেছনের দিক থেকে আসতে পারেনি। যা এসেছে তার সামনের দিক থেকে।

জাফর ছিলেন রাসূলের (সা) চাচাতো ভাই।

যুদ্ধে জাফরের শহীদ হবার খবর শুনে দারুণ মর্মাহত হলেন রাসূল (সা)। তিনি ব্যথাভরা হৃদয়ে জাফরের বাড়িতে যান। জাফরের স্ত্রী আসমাও ছিলেন অত্যন্ত সাহসিনী ও ধৈর্যশীলা। তিনিও ছিলেন ঈমানের বলে বলিয়ানা।

রাসূল (সা) যখন জাফরের বাড়িতে যান তখন জাফরের স্ত্রী আসমা স্বামীকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ভাবছেন, যুদ্ধ শেষ হলেই স্বামী তার ফিরে আসবেন ঘরে।

সুস্থ শরীরে। অক্ষত দেহে।

www.pathagar.com

আসমা আপন মনে স্বামীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছেন। তার আগেই রুটির জন্য আটা তৈরি করে রেখেছেন।

ছেলে মেয়েদের গোসল করিয়ে তেল মাখিয়েছেন। তাদেরকে নতুন পোশাক পরিয়েছেন।

এখন কেবল জাফর-তার প্রাণ-প্রিয় স্বামীর আগমনের পালা!

জাফরের বাড়িতে গিয়ে নিজের চোখে সবই দেখলেন দয়ার নবী (সা)। তাঁর দুচোখে নেমে এলো বেদনার ঢল।

কোমল কণ্ঠে বললেন আসমাকে, জাফরের ছেলেমেয়েদের ডাকো। নিয়ে এসো আমার কাছে।

ছোট্ট শিশুরা ছুটে চলে এলো রাসূলের (সা) কাছে।

রাসূল (সা) তাদেরকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর কোমল এবং প্রশস্ত বুকে।

তারপর আদরে আদরে ভরে দিলেন তাদের কচি কচি হৃদয়।

রাসূল (সা) জাফরের শিশুদেরকে চুমো দিচ্ছেন আর তাঁর দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির মতো কান্নার ধারা।

রাসূল (সা) কাঁদছেন!

দেখে ফেললেন আসমা।

জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ব্যাপার কি?

রাসূল (সা) কাঁপাকণ্ঠে বললেন, জাফর যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছে।

মুহূর্তেই নেমে এলো জাফরের বাড়িটিতে শোকের ছায়া।

থেমে গেল শিশুদের আনন্দ উল্লাস। থমকে গেল আসমার মুখের দীপ্তি।

বেদনার বরফে ঢাকা পড়ে গেল উপস্থিত মানুষগুলোর প্রোজ্জ্বল চেহারা।

রাসূল ম্রিয়মান। তিনিও কাতর।

www.pathagar.com

জাফরের শাহাদাতের শোকে দীর্ঘদিন যাবত রাসূল (সা) ছিলেন বিমর্ষ। শোকের আগুনে দগ্ধ হচ্ছিলেন দয়ার নবী মুহাম্মদ (সা)। পলেপলে, তিলে তিলে। রাসূলের (সা) বেদনায় কেঁপে ওঠে আল্লাহর আরশ।

অবশেষে তাঁর হাবীবের পক্ষ থেকে পেয়ে যান এক অবাক করা সুসংবাদ। সংবাদটি আনেন আল্লাহর বার্তাবাহক হযরত জিবরাইল। জিবরাইল রাসূলকে (সা) জানান, আল্লাহ্ পাক জাফরকে তার কর্তিত দুটি হাতের পরিবর্তে নতুন দুটি রক্তরাঙা হাত দান করেছেন। এবং তিনি জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছেন।

ফেরেশতাদের সাথে।

জাফর উপাধি পেলেন 'যুল-জানাহাইন' ও 'তাইয়ার'। অর্থাৎ দুই ডানাওয়ালা ও উড়ন্ত।

এই উপাধি আর পুরস্কার কেবল জাফরের জন্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর এক অনুগত, বিশ্বাসী আত্মত্যাগকারী বন্ধুর জন্য কেবল এই সম্মান।

জাফর!

দুঃসাহসী এক উড়ন্ত শহীদের নাম।

একটি সাহসের সমুদ্রের নাম।

জাফর বিন আবু তালিব (রা) শাহাদাতের প্রেরণা দানকারী এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের নাম।

www.pathagar.com

খাঁটি হলেন আলোক সমান

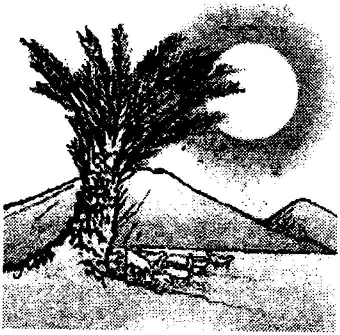

নাজিল হল সূরা আল হুজরাতের দ্বিতীয় আয়াত
"মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না। এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেভাবে উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেইভাবে উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।"
আয়াতটি নাজিল হবার সাথে সাথেই একজন, যার হৃদয়ে কেবল আল্লাহর প্রেম, ভয় আর আছে রাসূলের (সা) প্রতি ভালবাসা-
তিনি ছুটে এলেন বাড়িতে। ঊর্ধ্বশ্বাসে। এবং তারপর।-
তারপর খিল এঁটে দিলেন ঘরের দরোজায়। না, তিনি আর বার হবেন না। দেখাবেন না আর তার পাপিষ্ঠ মুখ দয়ার নবীকে (সা)।
ঘরের ভেতর এক অস্থির হৃৎপিণ্ড।
কেবলই তড়পাচ্ছে আত্মদহনে।
কেবলই ঝরাচ্ছেন চোখের লোনা পানি।

www.pathagar.com

আর শরমে কুঁকড়ে যাচ্ছে তার জ্বলজ্বলে জরোদ চেহারা!
গ্লানির সন্তাপে দগ্ধ হচ্ছে তার মুখমণ্ডল!
দীর্ঘশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসছে তার হৃদয়ের আর্তি :
"আমি একজন জাহান্নামের মানুষ!"
কীভাবে দেখাবেন তিনি তার তাপদগ্ধ মুখ প্রাণপ্রিয়
রাসূলকে (সা)!
সুতরাং ছেড়ে দিলেন সেই সোনালি প্রত্যাশা। এখন কেবল অবরুদ্ধ আছেন নিজের ভেতর-নিজেই।
সত্যিই যেন নিজগৃহে পরবাসী এক অচিন মানুষ!
কেটে যাচ্ছে অস্থির প্রহর।
রাসূলও সাক্ষাত পাচ্ছেন না তাঁর প্রিয় মানুষটির।
ব্যাপার কী? কী হয়েছে তার? তাহলে কি সে অসুস্থ? না কি অন্য কিছু? ভাবছেন দয়ার নবীজী।
তারপর জিজ্ঞেস করলেন তাঁর আর এক প্রিয় সাহাবীকে।
তিনি বললেন, না। সে অসুস্থ নয়।
তবে?
রাসূল (সা) খবর পাঠালেন তার কাছে।
শিগগীর দেখা করতে বল তাকে।
যথাসময়ে পেয়ে গেলেন তিনি রাসূলের (সা) নির্দেশ।
জবাবে সংবাদ বাহককে বললেন তিনি আরুদ্ধস্বরে :
নাজিল হয়েছে সূরা আল হুজরাতের এমনি একটি আয়াত। আর তোমরা তো জানই, তোমাদের মধ্যে আমিই কেবল সবার চেয়ে জোরে কথা বলি।
জোরে কথা বলি রাসূলের (সা) সামনেও।
সম্ভবত আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি! আমার সব আমল হয়তো বা বরবাদ হয়ে গেছে!

www.pathagar.com

এখন বল, কীভাবে দেখাবো এই ঘৃণিত মুখ, প্রাণপ্রিয় রাসূলকে? কীভাবে?

আফসোসে কেঁপে উঠলো তার কণ্ঠ।

তার আশংকার কথাটি দ্রুত পৌছে গেল রাসূলের কাছে।

তিনি হাসলেন একটু। তারপর বললেন :

"না! তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত কেউ নও সাবিত!

তুমি পৃথিবীতে বাঁচবে শুভ ও কল্যাণের সাথে।

আর তোমার মৃত্যুও হবে শুভ এবং কল্যাণের ওপর।"

উহ্! মালিক আমার! শুকরিয়া, শুকরিয়া হে পরওয়ারদেগার!

তাহলে মুক্ত আমি! মুক্ত আমি এই অকল্যাণকর পাপ থেকে!

সাবিতের বুকটা হাল্কা হয়ে গেল মুহূর্তেই। যেন এক নিমেষেই সরে গেল তার পাঁজরের ওপর থেকে হাজার টন ওজনের মহাভারী পাথরখণ্ড।

আর চোখের ওপর থেকে সরে গেল, দূরে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল কালো কালো শ্রাবণী মেঘ।

তিনি হেসে উঠলেন। হেসে উঠলেন প্রভাতের সূর্যের মত।

এবং তারপর।–

তারপর ভারমুক্ত হয়ে আবার শুরু করলেন সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে প্রিয় মানুষ–

রাসূলের কাছে যাতায়াত।

রাসূল (সা) ছাড়া কি তার একটি মুহূর্তও চলে! সাবিত রাসূলের কাছে যান আর প্রাণ ভরে টেনে নেন খোশবুদার নিঃশ্বাস। ঐ নিঃশ্বাসের সাথে মিশে আছে রাসূল প্রেম।

ঐ নিঃশ্বাসের সাথে মিশে আছে এক অপার্থিব সৌরভ

মিশে আছে এক অপার আনন্দ আর অসীম আবেগ।

সময়টা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো সাবিতের কাছে।

www.pathagar.com

বেশ তরতাজা আর শান্ত প্রহর বয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে।
ঠিক এমনি সময়।–
এমনি সময়ে একদিন আবার নাজিল হয় সূরা আন্ নিসার ৩৬তম আয়াত:
"নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।"
ব্যাস!
আবার কেঁপে উঠলো সাবিতের শংকিত হৃদয়। ভয়ে কম্পমান এক মোমের পুরুষ।
আত্মদহনে গলে গলে পড়ছেন কেবলই।
দৌড়ে আবারও ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিলেন তিনি।
বদ্ধঘরে প্রহর কাটান।
না, দেখাবেন না তিনি তার তাপিত মুখ, রাসূলকে। কাঁদছেন। কাঁদছেন সাবিত একাধারে। চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে তার শুভ্র বসন।
ভিজে যাক। ভিজে যাক সমস্ত দেহ। তবুও ঝরো অশ্রু।
ঝরে ঝরে নদী হও। হয়ে যাও সাগর-মহাসাগর। রোদনের সাগরে হাবুডুবু খাব এই আমিই। তবুও যদি পারি এতটুকু পরিশুদ্ধ হতে!
কী ব্যাপার!
সাবিত কোথায় গেল? সে আর দেখা করছে না কেন?
রাসূলের (সা) চোখে মুখে জিজ্ঞাসার ঢল।
তিনি লোক পাঠালেন সাবিতের কাছে।
সাবিত কম্পিত পায়ে হাজির হলেন রাসূলের (সা) দরবারে।
রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার সাবিত? দেখা করছো না কেন? কেনই বা আর আসছো না আমার কাছে? কী হয়েছে তোমার?
সাবিতের কণ্ঠটি ধরে এলো। বললেন তিনি সূরা আন্ নিসার নাজিলকৃত আয়াতটির কথা।

www.pathagar.com

তারপর বললেন :
"ইয়া রাসূলাল্লাহ!
হে আমার দয়ার নবীজী! আমি ভালবাসি সুন্দরকে।
আমি পছন্দ করি আমার সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব। আমার ভয় হচ্ছে, এই নাজিলকৃত আয়াতের আওতায় পড়ে গেছি কি-না!
সত্যিই আমার খুব ভয় করছে হে আমার প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা)!"
সাবিতের কথা শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রাসূলের (সা) চেহারা।
তিনি অভয় দিলেন। অভয় দিয়ে বললেন :
"তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত কেউ নও সাবিত!
তোমার পার্থিব জীবন হবে প্রশংসিত। আর তোমার এই জীবনের সমাপ্তি ঘটবে– গৌরবময় শাহাদাতের মাধ্যমে।
আর।– আর আখেরাতে তুমি হবে জান্নাতের অধিবাসী।"
রাসূলের (সা) অভয় পেয়ে ভারমুক্ত হলেন সাবিত।
আশ্বস্ত হল তার অশান্ত অন্তর।
তিনি শুকরিয়া জানালেন মহান রাব্বুল আলামীনকে।
আর রাসূলের (সা) প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসায় ভরে উঠলো তার তৃষিত হৃদয়। রাসূলের (সা) ভবিষ্যতবাণী বলে কথা!
সত্যিই দুনিয়ায় বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন সাবিত ইবন কায়স (রা)।
এবং শাহাদাদের মাধ্যমে শেষ করেছিলেন তার মহোত্তম জীবন।
আর আখেরাত?
সে ত রাসূলের (সা) কথা মতো নিশ্চিত হয়েই আছে তার জন্য জান্নাত। বিলাসবহুল প্রাসাদ।
কেন নয়? সারাটি জীবন তো কেবলই উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। ঈমানের পরীক্ষায়। বারবার।
পুড়ে পুড়েই তো খাক হয়েছেন। খাঁটি হয়েছেন–আলোক সমান।

www.pathagar.com

সাহসের ঢেউ

ছোট্ট শিশু।
শিশুটি হাঁটতে শিখেছে।
যেমন মিষ্টি চেহারা, তেমনি সুন্দর। সারাদিন হেঁটে বেড়ায়। এ ঘর থেকে ও ঘর। সারা পাড়ায়। কিন্তু যেখানে যাক না কেন, মনটা পড়ে থাকে অন্যখানে। মনটা বাঁধা থাকে অন্য এক গোলকে।
সেদিনও হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল সেই আলোর পর্বত–রাসূলের (সা) কাছে। খুব কাছে–
একেবারে রাসূলের (সা) গা ঘেঁষে বসলো সেই ছোট্ট ছেলেটি।
এমনিতেই রাসূল ভালবাসেন শিশুদেরকে।
তাছাড়া এই শিশুটি তো আরও প্রিয়।
তিনি তাকে পেয়ে খুব খুশি হলেন। তারপর আদর করলেন।
রাসূলের সামনে ছিল আঙ্গুরের ছড়া। সেখান থেকে দুটো ছড়া তার হাতে তুলে দিয়ে শিশুটিকে বললেন, নাও। এ থেকে একটি ছড়া তুমি খাবে, আর অন্যটি তোমার মাকে দেবে।
আঙ্গুরের ছড়া দুটো নিয়ে ছেলেটি আসছে বাড়ির দিকে। টসটসে আঙ্গুর। দেখলেই জিহ্বায় পানি এসে যায়। পথেই খেয়ে ফেললো

www.pathagar.com

তার ছড়াটি। এবার লোভ হয় দ্বিতীয় ছড়াটির জন্যে। টপাটপ সেটাও খেয়ে ফেললো।

কদিন পর সে আবার সেই রকম হাঁটতে হাঁটতে গেলো রাসূলের (সা) কাছে। রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! তোমার মাকে কি আঙ্গুরের ছড়াটি দিয়েছিলে?

ভীষণ লজ্জায় পড়লো শিশুটি।

মাথা নিচু করে আস্তে জবাব দিলো, না। আমি সেটাও খেয়ে ফেলেছিলাম।

রাসূল হাসলেন। আদর করে কাছে টেনে নিয়ে কানমলা দিয়ে দরদের সাথে বললেন, ওরে ঠকবাজ!

খুব ছোটবেলা থেকেই সে দেখেছে রাসূলকে (সা)।

দেখেছে খুব কাছ থেকে। এজন্যে রাসূলের (সা) আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল তার মধ্যে।

একেবারেই শৈশবকাল।

কিন্তু হলে কি হবে?

আর সবার মত সেও নামায আদায় করে। মনোযোগের সাথে করে আল্লাহর ইবাদাত। সব্বাই দেখে তো অবাক!

এত্তটুকু শিশু! অথচ কী তার আল্লাহর প্রতি আনুগত্য!

আর রাসূলের প্রতি ভালবাসা? সে তো তুলনাহীন।

রাসূলের (সা) স্নেহ আর ভালবাসায় সিক্ত এই সৌভাগ্যবন শিশুটির নাম- নুমান ইবন বাশীর (রা)

বড় হবার পরও তিনি ছিলেন সেই রকম, না-তার চেয়েও অনেক বেশি রাসূলপ্রেমিক। ছিলেন দ্বীনের প্রতি তূর পাহাড়ের মত অটল।

নুমান ছিলেন খুবই মেধাবী।

ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানী। তিনি তার সেই মেধা এবং জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখে গেছেন সারাটি জীবন।

www.pathagar.com

তিনি তখন কূফার ওয়ালী। মানে, শাসক বা প্রতিনিধি।
এ ধরেনের ক্ষমতার অধিকারীদের থাকে কত রকমের দাপট।
কিন্তু, না। নুমানের ছিল না কোনো দাপট। ছিল না কোনো দেমাগ।
তিনি নিজেকে ভাবতেন একজন সাধারণ মানুষ।
ভাবতেন জনগণের শুধুই একজন সেবক।
তার মধ্যে ছিল না কোনো লোভ।
ছিল না কোনো হিংসা কিংবা বিদ্বেষ। কিন্তু তার ছিল আল্লাহর প্রতি অপরিসীম আনুগত্য। তিনি বলতেন :
আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে শক্ত হবার চেয়ে আমি তার আনুগত্যে দুর্বল থাকা অনেক বেশি পছন্দ করি।
নুমান ছিলেন নানাবিধ গুণের অধিকারী। তিনি চমৎকার ভাষণ দিতে পারতেন। তার ভাষণে মুগ্ধ হতেন সবাই। কাজ ও চিন্তায় ছিলেন সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন। একবার তিনি কায়স ইবন আল-হায়সানকে একটি চিঠি দিলেন। চিঠিতে লিখলেন :
তুমি একজন দারুণ হতভাগ্য ব্যক্তি। আমরা রাসূলকে (সা) দেখেছি। তার হাদীস শুনেছি। আর তোমরা না তাকে দেখেছ, না তার মুখে হাদীস শুনেছ। রাসূল (সা) বলেছেন : কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ফেতনা-ফাসাদ দেখা দেবে নিয়মিত। ধারাবাহিক ভাবেই। মানুষ তখন সকালে মুসলমান হলে সন্ধ্যা হতে না হতেই আবার কাফের হয়ে যাবে।
সামান্য পার্থিব লোভ-লালসা আর সুযোগ-সুবিধার জন্যে বিক্রি করে দেবে আখেরাতকে।
নুমান ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর।
কিন্তু কোমল ছিল তার হৃদয়। ফুলের পাঁপড়ির মত নরম ছিল তার মনটি। সেখানে জমা ছিল মানুষের প্রতি দরদ, ভালবাসা, দয়া ও দানশীলতা।

www.pathagar.com

মানুষের বিপদে-আপদে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। বাড়িয়ে দিতেন তাদের প্রতি সাহায্যের হাত।

নুমান তখন হিমসের ওয়ালী।

সেই সময়ে একদিন তার কাছে এলেন একজন বিখ্যাত কবি। নাম–আল আ'শা আল হামদানী।

কবির দিকে নুমান তাকালেন সম্মানের দৃষ্টিতে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি জন্যে এসেছেন। কবি বললেন,

আমি ইয়াযীদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তিনি কোনো সাড়া দেননি। এখন এসেছি আপনার কাছে, আত্মীয়তার হক কিছু আদায় করুন। আমি অনেক ঋণ আছি। আপনি মেহেরবানী করে আমার ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করুন।

কবির দুর্দশার কথা শুনে খুব ব্যথিত হলেন নুমান। তার হৃদয়ে ঝড় উঠলো বেদনার। তিনি মর্মাহত হলেন।

ভাবলেন কিছুক্ষণ। কী করা যায় কবির জন্যে!

কবিকে দেবার মত তার হাতে তখন কোনো অর্থ-কড়ি ছিল না। ছিল না দেয়ার মত কোনো সম্পদ।

কী করা যায়! কীভাবে সহযোগিতা করা যায় এই সম্মানিত কবিকে? কিছুটা মুশকিলে পড়লেন যেন।

বেশ কিছুক্ষণ ভাববার পর তিনি কবিকে আশ্বস্ত করে বললেন, ভাববেন না। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কবিকে আশ্বস্ত কর র পর তিনি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে গেলেন। সমবেত প্রায় বিশ হ জার মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি সবাইকে সহযোগিতা করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। তার অনুরোধে উপস্থিত সকলেই উদ্বুদ্ধ হলেন। দান করলেন প্রত্যেকেই।

www.pathagar.com

নুমানের এই উপস্থিত বুদ্ধি এবং অকৃত্রিম আন্তরিকতায় কবি মুক্ত হলেন বিরাট অংকের ঋণ থেকে।

নুমান ছিলেন সততা এবং ন্যায়-নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল উপমা।

তিনি একবার তার ভাষণে বলেন :

রাসূলুল্লাহ (সা) এই মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : যে ব্যক্তি অল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে বেশিরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না।

আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করাই হচ্ছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর স্বীকার না করাই হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা।

নুমান ছিলেন উদার এবং সহনশীল।

তিনি ছিলেন সাহসী।

দীনের ব্যাপারে, সত্যের ব্যাপারে তিনি কখনো সমঝোতা করতেন না।

সেখানে তিনি ছিলেন সর্বদাই আপোষহীন।–

আপোষহীন যেন এক সাহসের ঢেউ।

www.pathagar.com

স্বপ্ন যখন সত্য হলো

ইয়ামেনের রাবিয়া ইবনে নসর ছিলেন একজন দুর্বল ও পরাধীন রাজা। একবার তিনি একটি স্বপ্ন দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। সাথে সাথে তিনি দেশের সকল গণক, যাদুকর এবং জ্যোতিষীকে তলব করলেন। তারা সবাই একত্রিত হলে রাজা বললেন, আমি গত রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি।
তোমরা আমাকে জানাবে যে, আমি কি স্বপ্ন দেখেছি এবং তার ব্যাখ্যাই বা কি?
তারা বললো, হে মহারাজ! আপনি আগে আপনার স্বপ্নের কথাটা বলুন। তারপর আমরা তার ব্যাখ্যা আপনাকে জানাবো।
রাজা বললেন, যদি আমি আমার স্বপ্নের কথাটা বলে দিই তাহলে তার ব্যাখ্যা শুনে আমি আর তৃপ্তি পাবো না। কেন না, আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা সেই করতে সক্ষম হবে, যে আমার স্বপ্নের কথাটাও বলতে পারবে।
জ্যোতিষীদের মধ্যে একজন বললো, জাঁহাপনা! যদি এইভাবে আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেতে চান, তাহলে সতীহ এবং শেককে ডেকে পাঠান। তাদের চেয়ে এ ব্যাপারে যোগ্য আর কেউ নেই। আপনি যা জানতে চান, তা তারা নিমিষেই বলে দিতে পারবে।
ঐ দু'জন ভবিষ্যৎ বক্তাকে রাজা ডেকে পাঠালেন। প্রথমে রাজার দরবারে হাজির হলো সতীহ।

www.pathagar.com

রাজা তাকে বললেন, আমি এমন একটা স্বপ্ন দেখেছি, যাতে করে আমি ভয় পেয়ে গেছি। তুমি যদি বলতে পারো যে, আমি কি স্বপ্ন দেখেছি, তাহলে তার ব্যাখ্যাও সঠিকভাবে আমাকে জানাতে পারবে। এবার বলো তো, আমার স্বপ্নটা কি ছিল?

সতীহ বললো, ঠিক আছে। আমি প্রথমে আপনার স্বপ্নের কথাটা বলতে চেষ্টা করছি। একটু ভেবে নিলো সতীহ।

তারপর বললো, জাঁহাপনা! আপনি স্বপ্ন দেখেছেন, অন্ধকারের ভেতর থেকে এক টুকরো আগুন বেরিয়ে এসে নিচু ভূমিতে নামলো এবং সেখানে যত প্রাণী ছিলো, সবাইকে গ্রাস করলো।

সতীহর কথা শুনে রাজার চোখদু'টো আনন্দে চিক চিক করে উঠলো।

বললেন, বাহ! তুমি সত্যিই খুব যোগ্য লোক। আমার স্বপ্নটির কথা তুমি ঠিকভাবে বলতে পেরেছো। এবার তাহলে এর ব্যাখ্যাটা আমাকে শোনাও।

সতীহ এবার একটু ভেবে নিলো।

তারপর বললো, আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, আবিসিনিয়াবাসী আপনার ভূখণ্ডে প্রবেশ করবে এবং সমগ্র ইয়ামেন দখল করে নেবে।

চমকে উঠলেন রাজা। বললেন, বলো কি! এটাতো ভীষণ বেদনাদায়ক ব্যাপার! এটা কবে ঘটবে? কার আমলে?

সতীহ বললো, এটা ঘটবে আপনার আমলের কিছু পরে। তখন ষাট কিংবা সত্তর বছর পার হয়ে যাবে। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, এই ভূখণ্ড কি চিরকালই তাদের দখলে থাকবে? নাকি তাদের জবর দখলের অবসান ঘটবে?

সতীহ জবাবে বললো, সত্তর বছরের কিছু বেশি কাল পার হবার পর তাদের দখলের অবসান ঘটবে। তারপর হয় তারা নিহত হবে, নয়তো পালিয়ে যাবে।

রাজা ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাদেরকে কে হত্যা করবে? কে তাড়িয়ে দেবে?

www.pathagar.com

রাজার এই প্রশ্নের জবাবে সতীহ্ বললো, ইরামের হাতে তারা নিহত বা বহিষ্কৃত হবে। এডেন থেকে আবির্ভূত হবেন ইরাম। ইয়ামেনে তাদের একজনকেও তিনি অবশিষ্ট রাখবেন না।
-ইরামের আধিপত্য কি চিরস্থায়ী হবে না কি অস্থায়ী?
-তাদের আধিপত্য অস্থায়ী হবে।
-কার হাতে সেই ক্ষমতার অবসান ঘটবে?
-এক পুত : পবিত্র নবীর হাতে। তিনি উর্ধ জগত থেকে ওহী লাভ করবেন।
সতীহর কথা শুনে রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন, এ নবী কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করবেন?
সতীহ্ বললো, সেই নবী নাফারের পুত্র মালেক, মালেকের পুত্র ফিহির, ফিহিরের পুত্র গালেবের বংশ থেকে আগমন করবেন। তাঁর জাতির হাতে ক্ষমতা থাকবে বিশ্ব জগতের সমাপ্তি ঘটার পূর্ব পর্যন্ত।
রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বিশ্ব জগতের আবার শেষ আছে নাকি?
সতীহ্ বললো, হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে। যে দিন পৃথিবীর প্রথম এবং শেষ মানুষেরা একত্রিত হবে। যারা ভাল কাজ করবে, তারা সুখে-শান্তিতে থাকবে আর যারা অসৎ কাজে লিপ্ত থাকবে, তারা সে দিন খুব দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে।
রাজা এবার আরও বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভবিষ্যৎ বাণী কি সত্য?
সতীহ্ বললো, হ্যাঁ, সত্য। আমি যা বলেছি তা একশো ভাগ সত্য।
এরপর ডাকা হলো বিখ্যাত ভবিষ্যৎ বক্তা শেককে। সে প্রবেশ করলে রাজা তার কাছে তার স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করলেন।
শেক জবাবে রাজার স্বপ্নের কথা বলে দিলো।
শেকের জবাব শুনে রাজা তো অবাক! একি! দু'জনের কথা হুবহু মিলে গেল! উভয়ের স্বপ্নের কথাটি ছিলো একই। অভিন্ন।

www.pathagar.com

এরপর রাজা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন শেকের কাছে।
সতীহ'র সাথে শেকের কোনো যোগাযোগ হয়নি। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনে শলা-পরামর্শও হয়নি। অথচ কি আশ্চর্য! শেকের স্বপ্নের ব্যাখ্যার সাথে সতীহ'র ব্যাখ্যা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।
রাজা শেককে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যা বলেছো তাকি সঠিক?
শেক জবাবে বললো, অবশ্যই। আমি আপনার কাছে যে ভবিষ্যৎ বাণী করলাম, তা সঠিক এবং সন্দেহমুক্ত। আপনি এই ব্যাখ্যার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।
এই দুই ভবিষ্যৎ বক্তার অভিন্ন ব্যাখ্যা শুনে রাজা খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তাদের কথা বিশ্বাস করলেন। রাজা তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে এতোটাই ঘাবড়ে গেলেন যে, তিনি আর দেরি না করে তার পরিবার-পরিজনকে তাড়াতাড়ি ইরাকে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর পারস্যের তৎকালীন সম্রাট শাপুরকে চিঠি লিখে পাঠালেন। রাজার চিঠি বলে কথা। তার চিঠি পেয়ে সম্রাট শাপুর রাজা রাবিয়ার পরিবারকে হিরাতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিলেন।
নবী মুহাম্মাদ (সা) আসার বহু আগেই সতীহ এবং শেক যে নবীর আগমনের কথা রাজাকে জানিয়েছিলো, সেই নবী আর কেউ নন- হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
রাবিয়া ইবন নসরের মৃত্যুর পর সত্যিই ইয়ামেনের রাজত্ব চলে যায় আবু কারব হাসসান ইবনে তুব্বান আসআদের হাতে এবং তারপর একে একে ঘটে গেল সেই দু'জন জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী মোতাবেক সকল ঘটনা।
কি বিস্ময়কর ব্যাপার! রাজার স্বপ্নটিই ছিলো কেবল স্বপ্ন। তবুও সেই স্বপ্নটিই হয়ে গেল সত্যেরও অধিক! বহু বছর পর হলেও রাবিয়া ইবন নসরের স্বপ্নটি সত্যে পরিণত হলো। নবী মুহাম্মাদ (সা) সত্যিই আলোকিত করলেন এই বিশ্বকে। বিশ্বজগতকে।

www.pathagar.com

বন্ধু তিনি পরম প্রিয়

কী এক উজ্জ্বল নক্ষত্র!
কী এক সুন্দর, ভীষণ সুন্দর আলোকিত পুরুষ!
যেমন তার চেহারা, তেমনি দেহের গড়ন। বরফের বৃষ্টির মত ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে যেন নূরাণী ধারা।
সুঠাম দেহ। গোসহীন গণ্ডদেশ! ঘন দাড়ি। ঘন চুল। বুট ও কোমর চওড়া। কান পর্যন্ত ঝোলানো জুলফি। পায়ের নলা মোটা। ঘন পশমে ভরা লম্বা বাহু। মেহেদি রঙের দাড়ি। স্বর্ণখচিত দাঁত।
আর চেহারা?
চেহারাটি উজ্জ্বল ফরসা। ঠিক যেন আলতা মাখানো দুধ।
এমনি গড়ন ও চেহারার একটি মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে তার দিকে না তাকিয়ে কেইবা আর পারে? তারপর যদি সেই লোকটি হন স্বভাবে আচরণে নম্র, ভদ্র, লাজুক, পরিচ্ছন্ন এবং বিনয়ী—তাহলে তো কথাই নেই। হ্যাঁ, এমনি একজন মানুষ ছিলেন হযরত উসমান (রা)। সোনার মানুষ। আমাদের তৃতীয় খলিফা। উসমান ছিলেন খুবই বিনয়ী, লাজুক এবং দানশীল।
ইসলাম গ্রহণের আগেও তিনি তার এইসব গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ছিলেন অতি পরিচিত তার গোত্র এবং চারপাশের সকলের কাছে। সবার কাছে তিনি ছিলেন অতি প্রিয়জন। আপন মানুষ। সম্মান, মর্যাদা, স্নেহ কিংবা শ্রদ্ধার ঢল নামতো উসমানের জন্য। কেন না উসমানের মত এমন দিল-দরিয়ার মানুষ, এমন ভদ্র এবং সুন্দর মানুষ কতজনইবা

www.pathagar.com

আছে? বিশেষ করে সেই সময়ে? কুরাইশদের মধ্যে?
তার যোগ্যতাও ছিল সেই পরিমাণে।
তিনি ছিলেন একাধারে কুষ্টিবিদ্যা বিশারদ। কুরাইশদের প্রাচীন ইতিহাসেও ছিল তার গভীর জ্ঞান। আর ছিল অসীম প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, সৌজন্য ও মানবিকতা বোধ। আত্মমর্যাদা বোধও ছিল তার অত্যন্ত প্রখর। তিনি নিজে যেমন কাউকে অপমান করতেন না, ঠিক তেমনি নিজেও অপমানের কষ্ট সইতে পারতেন না।
আচরণগত দিক থেকেও তিনি ছিলেন সতর্ক।
সেটাই তো স্বাভাবিক। কারণ তার বংশটিও ছিল যে দারুণ মর্যাদাসম্পন্ন। তিনি তার মার্জিত, সুন্দর আচরণের প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিলেন আপন পরিবার থেকে। তারপর ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও আলোতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন শিক্ষিত এবং আলোকিত। সে কথা তো লেখা আছে ইসলামের ইতিহাসের পাতায় পাতায়।
হযরত উসমান! ইসলাম গ্রহণের আগেও স্বভাব ও চরিত্রের কারণে তার চারপাশ গুলজার করে থাকতো কেবল মানুষ আর মানুষ।
পরিবারের ঐতিহ্য ছিল ব্যবসা। তিনিও ব্যবসায়ে নামলেন।
সততা, নিষ্ঠা আর শ্রমে গড়ে উঠলো তার অর্থের ভাণ্ডার। ভরে গেল তার হৃদয়ের চাতাল। তিনি সেই অর্থ থেকে খরচ করেন দুহাতে। মানুষের জন্য। গরীব, দুঃখী আর অভাবী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য। অকাতরে বিলিয়ে দেন তিনি তার সঞ্চিত সম্পদ। দেবেন না কেন?
কারুর কষ্ট যে তিনি সইতে পারেন না। দেখতে পারেন না কারুর চোখের পানি কিংবা এতটুকু আহাজরি। গোত্র থেকে অন্য গোত্র– এভাবে বহুদূর থেকে ছুটে আসে দুঃখী মানুষ তার কাছে। তিনি তার অর্থ দিয়ে, কথা দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে হাসি আর খুশির একেকটি তরতাজা গোলাপ তুলে দেন তাদের হাতে।
সান্ত্বনা আর প্রশান্তি নিয়ে ফিরে যায় তারা উসমানের [রা] কাছ থেকে।
সেই উসমানই আবার ইসলাম গ্রহণের পর লাঞ্ছিত হলেন তার আপনজনের কাছে। লাঞ্ছিত হলেন গোত্র এবং অন্যদের হাতেও।
কী নিদারুণ পরিতাপ! কেন তিনি লাঞ্ছিত হলেন? সে কেবল ইসলাম

www.pathagar.com

কবুল করার কারণেই। তার আপন চাচা, যার সাথে রক্তের সম্পর্ক- সেই চাচা হাকাম ইবন আবিল আসও উসমানকে নির্মমভাবে অত্যাচার করলো।

তাকে শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে পাষণ্ডের মত মারলো। বললো, উসমান! তুমি একটি নতুন ধর্ম গ্রহণ করে আমাদের বাপ-দাদার ধর্মের মুখে চুনকালি দিয়েছো। তুমি আমাদের ও গোত্রের অপমান করেছো। বলো! তুমি এ ধর্ম ত্যাগ করবে কিনা? যদি ত্যাগ না করো তাহলে তোমার ওপর শাস্তির পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। এখনও সময় আছে। শিগগির করে বলো।

চাচার মার এবং হুমকিতে এতটুকু কাঁপলো না উসমানের বুক। বরং অসীম সাহস আর ধৈর্যের পর্বতে নিজেকে বেঁধে জবাব দিলেন, চাচা! আপনার যা খুশি তাই করুন। যত ইচ্ছা শাস্তি দিন। তবু, তবুও আমি ছাড়বো না, ছাড়তে পারবো না আল্লাহর মনোনীত এবং রাসূল মুহাম্মাদের [সা] প্রচারিত দীন-ইসলাম। আপনি জানেন না চাচা, এটা এমন এক প্রশান্তি ও আরামের আশ্রয়স্থল যেখানে প্রবেশ করলে পৃথিবীর গনগনে আগুনকেও মনে হয় ফুলের পাপড়ি। তখন কোনো ভয়, কোনো শাস্তি কিংবা হুমকিতেও কিছুই যায় আসে না।

উসমানের সাহসে ছিল না কোনো ভয়ের লেশ। উচ্চারণে ছিল না কোনো দ্বিধার কুয়াশা। চোখের চাহনিতে ছিল না কোনো সংশয়ের চিহ্ন। তার সাফ জবাবে কেঁপে উঠলো চাচার বুক। তাহলে? তাহলে ইসলামের পথ থেকে কীভাবে ফেরানো যায় এই দুর্দমনীয় সাহসী বাজকে? কিভাবে? ইসলামের পথ থেকে উসমানকে ফেরানোর জন্য সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। ফিরলেন না উসমান। বরং বাঁধার পর্বত যত উঁচু হয়, যত দুর্গম হয় তার পথ, ততো বেশি সাহসী হয়ে ওঠেন উসমান।

সবই দেখছেন দয়ার নবীজী [সা]। দেখছেন আর ভাবছেন। ভাবছেন, হ্যা ঈমান তো এমনটিই দাবি করে। তিনি খুশি হলেন। খুশি হলেন উসমানের দৃঢ়তার প্রতি। তার আস্থা এবং বিশ্বাসের প্রতি।

রাসূল [সা] উসমানের প্রতি এতই খুশি ছিলেন যে, তার আদরের দুলালী কন্যা রুকাইয়্যাকে বিয়ে দিলেন উসমানের সাথে।

www.pathagar.com

নবুওয়তের পঞ্চম বছর। এ সময়ে কুরাইশদের অত্যাচার আর নিষ্ঠুরতায় অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানদের প্রথম যে দলটি হাবশায় হিজরত করলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন উসমান এবং তার স্ত্রী রাসূলের কন্যা রুকাইয়্যাও। প্রহর যায়। সময় যায়। একে একে কেটে যায় দীর্ঘদিন। তবুও কোনো খবর পাচ্ছেন না নবী মুহাম্মাদ (সা) কেমন আছে জামাতা উসমান এবং আদরের কন্যা রুকাইয়্যা?

খবরটি জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন দয়ার নবীজী।

ঠিক এমনি সময়ে একজন মহিলা হাবশা থেকে এলেন মক্কায়। তিনি নবীকে (সা) জানালেন, হে রাসূল (সা) আমি দেখেছি, দেখেছি রুকাইয়্যা গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আছে আর উসমান গাধাটিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মহিলাটির কাছে এই কথা শুনার সাথে সাথেই দুআ করলেন রাসূল। তাদের জন্য। বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তার সহায় হোন। লুতের (আ) পর উসমানই আল্লাহর রাস্তায় পরিবার পরিজনসহ প্রথম হিজরতকারী।

উসমান ছিলেন বিনয়ী এবং লাজুক। কিন্তু ইসলামের খেদমতে, প্রয়োজনে তিনিই আবার হয়ে উঠতেন ভীষণ ভয়ংকর এবং দুঃসাহসী। বদর যুদ্ধে তিনি অংশ নিতে পারেননি স্ত্রী রুকাইয়্যার মারাত্মক অসুস্থতার কারণে। এছাড়া প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি অংশ নিয়েছেন।

আর সেই যে হুদাইবিয়ার ঘটনা! সেটা তো এখন ইতিহাসেরই একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে গেছে।

রাসূল (সা) ডাকলেন উমরকে। বললেন, তুমি মক্কায় যাও। সেখানকার নেতৃবৃন্দকে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাও।

খুব বিনীতভাবে উমর বললেন, হে রাসূল (সা)! আপনি তো জানেন, জানেন তাদের সাথে আমার তিক্ত সম্পর্কের কথা। কুরাইশদের কাছ থেকে আমার জীবনের আশংকা করছি। আমি মনে করি, উসমানই একাজের জন্য অনেক বেশি উপযুক্ত।

রাসূল (সা) এবার ডাকলেন উসমানকে। বললেন, যাও। তুমি মক্কায় গিয়ে আবু সুফিয়ানসহ কুরাইশদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে বলো, আমরা যুদ্ধ নয়, বরং বাইতুল্লাহর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি।

www.pathagar.com

রাসূলের (সা) পয়গাম নিয়ে রওয়ানা হলেন উসমান। মক্কার কুরাইশদের দিকে।
তিনি পৌঁছেই রাসূলের (সা) পয়গাম পেশ করলেন তাদের সামনে।
তারা উসমানকে বললো, ওসব কথা থাক। ইচ্ছে করলে তুমি তাওয়াফ করতে পার পবিত্র বাইতুল্লাহ। তাদের এই প্রস্তাব খুব দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করলেন উসমান। বললেন, না! আল্লাহর রাসূল যতক্ষণ না তাওয়াফ করেন, ততোক্ষণ আমি তাওয়াফ করবো না। করতে পারি না!
তার কথায় রেগে গেল কুরাইশরা। তারা তাকে আটকে রাখলো তিনদিন। কিন্তু এতটুকুও ভেঙ্গে পড়লেন না উসমান।
উসমান গিয়েছেন মক্কার কুরাইশদের কাছে। রাসূলের (সা) পয়গাম নিয়ে। কিন্তু ফিরছেন না কেন?
এদিকে ক্রমশ দুশ্চিন্তা আর আশংকা ঘিরে ধরেছে হুদাইবিয়ার মুসলিম শিবিরে। খবর রটে গেল, বর্বর কুরাইশরা হত্যা করেছে উসমানকে। উসমান শহীদ হয়েছে?
রাসূলও (সা) বিচলিত হলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, উসমানের রক্তের বদলা না নিয়ে আমরা ফিরে যাবো না!
রাসূল (সা) নিজের ডান হাতটি বাম হাতের ওপর রেখে বললেন,
হে আল্লাহ! এ বাইয়াত উসমানের পক্ষ থেকে।
সে তোমার ও তোমার রাসূলের কাজে মক্কায় গেছে।
অবশেষে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন হযরত উসমান কুরাইশদের কাছ থেকে। অক্ষত অবস্থায়। ফিরে এসে তিনি জানতে পারলেন বাইয়াতের কথা। জানতে পেরে তিনিও রাসূলের (সা) হাতে বাইয়াত করলেন।
আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা) এবং ইসলামের জন্য নিজের জান এবং মালকে কুরবানী দিয়েছিলেন হযরত উসমান।
তার ছিল অনেক সম্পদ। কিন্তু তাই বলে তিনি বিলাসী ছিলেন না।
সেই সম্পদকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন দীনের পথে। সবকিছু উজাড় করে দিয়ে।
তাবুক অভিযানের ঘোষণা দিলেন রাসূল। ঘোষণা দিলেন সবার প্রস্তুতির জন্য।

www.pathagar.com

কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় মুসলিম বাহিনীর এত বিপুল বিশাল খরচের অর্থ?

রাসূল (সা) ব্যয় নির্বাহের জন্য সাহায্যের আবেদন জানালেন। রাসূলের আহবানে সাড়া দিয়ে একে একে এগিয়ে এলেন সকল সাহাবী।

হযরত আবু বকর তার সকল অর্থ তুলে দিলেন রাসূলের (সা) হাতে। উমর দিলেন তার অর্ধেক অর্থ। আর এই যুদ্ধের এক তৃতীয়াংশ সৈন্যের ব্যয়ভার নিজ কাঁধে তুলে নিলেন হযরত উসমান। তিনি সাড়ে নয় শো উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া ছাড়াও দান করেন এক হাজার নগদ দীনার। রাসূল (সা) দীনারগুলো নেড়ে চেড়ে দেখেন আর বলেন,

আজ থেকে উসমান যা কিছু করবে, কোনো কিছুই তার জন্য ক্ষতিকর হবে না।

এই দানে রাসূল (সা) এতই খুশি হয়েছিলেন যে, তিনি উসমানের আগে-পিছের সকল গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন এবং তাকে জান্নাতের ওয়াদা করেন।

শুধু তাবুক নয়। সকল যুদ্ধেই তিনি এভবে আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন। দান করতেন প্রাণ খুলে।

ইসলামের সেই প্রথম পর্যায়ে, সেই ভয়ানক সংকটকালে উসমান যেভাবে আল্লাহর রাস্তায় দান করেছেন তা নজিরবিহীন। তিনি রাসূলের (সা) আহবানে ইহুদীদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কিনে নেন ঐতিহাসিক সেই কূপ–'বীরে রুমা'। তারপর সেই কূপটি তিনি ওয়াক্‌ফ করে দেন মদীনার মুসলমানদের জন্য। কূপটি পাবার কারণে মদীনাবাসীদের দীর্ঘদিনের পানির কষ্ট ঘুচে গেল।

কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস!

তারই কেনা কূপ 'বীরে রূমা'র এক গ্লাস পানিও তিনি পাননি তার গৃহবন্দী অবস্থায়।

সেই দুঃসহ দুঃসময়ে তার বাড়িতে কূপের পানি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

ঘেরাও অবস্থায় একদিন তিনি 'বীরে রুমা'র দিকে আফসোস ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। জানালার ফাঁক দিয়ে। মদীনাবাসীদের স্মরণ

www.pathagar.com

করিয়ে দিয়ে উসমান ব্যথাভরা কণ্ঠে বললেন, রাসূলের (সা) নির্দেশে আমিই 'বীরে রুমা' কিনে তা সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফ করেছি। আজ সেই কূপের পানি থেকেই তোমরা আমাকে বঞ্চিত করছো! আজ আমি পানির অভাবে ময়লা নোংরা পানি দিয়ে ইফতার করছি! হৃদয় বিদারক এক বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে!

যে উসমানের ত্যাগ ও দান ইসলামের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল, যিনি কাবুল থেকে মরক্কো পর্যন্ত–এই বিশাল ভূভাগের খলিফা, তিনিই কিনা পরাজিত ইহুদী শক্তির চক্রান্তে গৃহবন্দি অবস্থায় দুঃসহ জীবনযাপন করছেন।

খাবার নেই, পানি নেই, নেই মুক্ত বাতাস। আজ তার জন্য পার্থিব সকল দুয়ার বন্ধ!

দুনিয়ার এমন কোন রাজা-বাদশা আছেন যে এ ধরনের অবরোধ বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে মেনে নেবেন? নেবেন না।

কিন্তু উসমান বাদশা ছিলেন না, ছিলেন একজন খলিফা। আর খলিফা ছিলেন বলেই তিনি চাননি কোনো রকম রক্তপাত। বরং নিজের শরীরের পবিত্র রক্ত দিয়ে, শাহাদাতের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করলেন তার মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব আর ঔদার্য। বিদ্রোহীরা যখন খলিফর বাড়িতে প্রবেশ করলো, তখন খলিফা উসমান রোযা অবস্থায় কুরআন তিলওয়াত করছিলেন। তারা সেই অবস্থায় তাকে নির্মমভাবে হত্যা করলো।

দয়ার নবীজী বহুবারই উসমানকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবে উসমান।

সত্যিই তো! এমন এক আলোর দ্যুতি, যিনি রাসূলের (সা) সময়ে ছিলেন ওহী লেখক, আবুবকর ও উমরের খিলাফত কালে ছিলেন পরামর্শদাতা, যিনি সারা বছরই রোযা রাখতেন, সারাটি রাত কাটিয়ে দিতেন আল্লাহর ইবাদাতে, যিনি এক রাকআতে একবার কুরআন খতম করতেন, যার সকল সম্পদ এবং নিজেই কুরবানী হয়েছেন আল্লাহর রাস্তায়–তিনিই তো বন্ধু হবেন রাসূলের (সা), একান্ত বন্ধু। সেটাই তো স্বাভাবিক। হযরত উসমান! বন্ধু তিনি পরম প্রিয়।

www.pathagar.com

বা সা প

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

ISBN 984-485-093-2

9 789844 850934